এপ্রিল ২০২২ ■ চৈত্র ১৪২৮-বৈশাখ ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

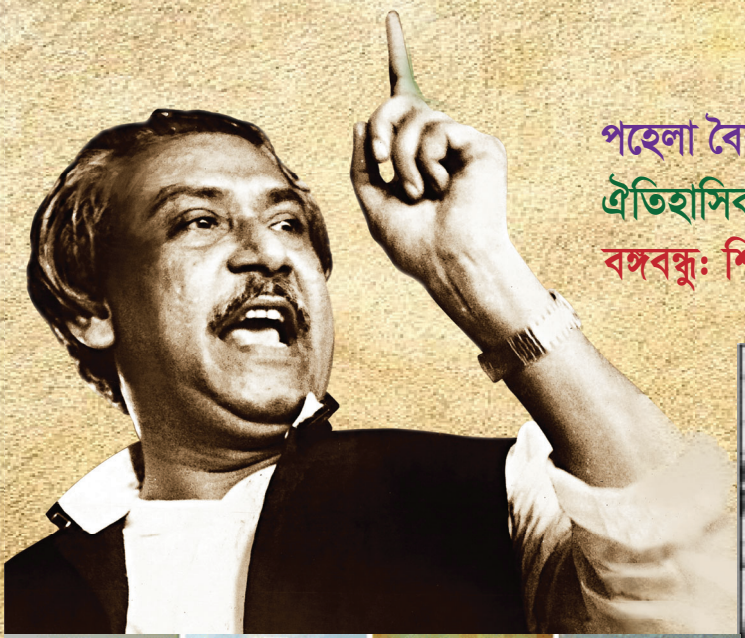

পহেলা বৈশাখ: বাংলা নববর্ষ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস

বঙ্গবন্ধু: শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধু

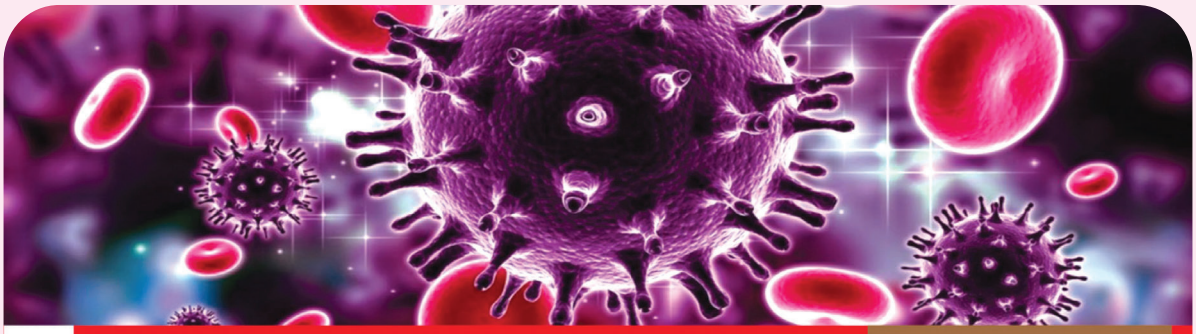

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

এপ্রিল ২০২২ ❑ চৈত্র ১৪২৮-বৈশাখ ১৪২৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ ২০২২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে গণভবনে 'ডাকটিকিটে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী' শীর্ষক অ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

বাঙালির জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য উৎসব বাংলা নববর্ষ। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ বর্ষবরণের মাধ্যমে বাঙালি নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। মঙ্গল শোভাযাত্রা, বৈশাখি মেলা, অন্যান্য আরও নানা আয়োজনে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। বিগত দুই বছর বিশ্বব্যাপী মহামারি করোনার কারণে বাংলা নববর্ষ সেভাবে উদ্‌যাপিত হয়নি। বাঙালি ঘরে বসে সীমিত পরিসরে উদ্‌যাপন করেছে নববর্ষ। করোনার বিস্তার বেশ কমে যাওয়ায় এ বছর ১৪২৯-এর পহেলা বৈশাখ বাঙালি নতুন উদ্যমে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। পুরানো জরাজীর্ণকে ঝেড়ে ফেলে নতুন আগামীর সম্ভাবনায় নববর্ষকে বরণ করে নেয়। বাংলা নববর্ষ ও বর্ষবরণ নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

প্রতিটি মুসলমানের জন্যই রমজান হলো অনেক নিয়ামত, রহমত ও মাগফিরাতের মাস। অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মাসের ফজিলত অনেক বেশি। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে রোজাও একটি ভিত্তি। রমজানের রোজার মাধ্যমে আমরা সংযমের শিক্ষা লাভ করি। রমজান মাসের সর্বাধিক উত্তম একটি রাত হলো লাইলাতুল কৃদরের রাত। এই মাসের এবাদত বন্দেগির ফজিলত অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক গুণ বেশি। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এপ্রিল ২০২২ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ ও কবিতা।

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে এদিন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে বন্দি থাকা অবস্থায় তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে এ সরকারের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ ও নিবন্ধ।

২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়। অটিজম এমন একটি রোগ যার ফলে শিশুর মস্তিষ্ক সঠিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। মানসিক বিকাশসংক্রান্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত এমন শিশুর প্রতি সংবেদনশীল যত্ন ও আচরণই পারে শিশুকে কর্মক্ষম, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল রাখতে। বিশ্ব অটিজম দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ।

২০১২ সালে ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। প্রতিবছর এ দিবসকে নিয়ে থাকে নানা আয়োজন। জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় রয়েছে নিবন্ধ। এছাড়া গল্প, কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক নিয়মিত প্রতিবেদন নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যাটি। সবার জন্য নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস: একটি পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা ৪
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

নববর্ষের কড়চা ৭
প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ ১০
জাফর ওয়াজেদ

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ বনাম মার্কিন সপ্তম নৌবহর ১২
খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীন

কৃষিবান্ধব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ১৫
প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ১৭
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বঙ্গবন্ধু: শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধু ২০
অনুপম হায়াৎ

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা ২২
ড. সুলতানা আক্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু ২৬
মিলন সব্যসাচী

নব উদ্যমে ফিরছে বৈশাখ ২৯
শামসুজ্জামান শামস

সালাত ও সিয়াম ৩১
মুহাম্মদ ইসমাঈল

পহেলা বৈশাখ আমাদের আত্ম-জাগরণ ৩৩
গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

বৈশ্বিক সুখী দেশের সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি ৩৫
ফারিহা হোসেন

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ৩৬
সুস্মিতা চৌধুরী

পুরুষেরও পর্দা করতে হবে ৩৮
জেসমিন বন্যা

বাঙালির প্রাণের মেলা বৈশাখি মেলা ৩৯
ইসমত আরা পলি

অটিজম: অবহেলা নয়, চাই সচেতনতা ৪০
শায়লা আক্তার

চারুকলার প্রত্যাবর্তন ৪২
আজমেরী সুলতানা

গল্প

একটি প্রাইমারি স্কুল ৪৩
নাসিম সুলতানা

সমু পাগলা ৪৪
জসীম আল ফাহিম

কবিতাগুচ্ছ ৪৬-৪৮
আসলাম সানী, কাজী সুফিয়া আখ্‌তার, পারভীন আক্তার লাভলী, এম ইব্রাহীম মিজি, আব্দুল আওয়াল রনী, মো. মোস্তাফিজুর রহমান, আতিক রহমান, বেগম শামসুন নাহার, হাসান হাফিজ, রুস্তম আলী, নিকুঞ্জ কুমার বর্মন, মো. কামাল শেখ, ইজামুল হক, এস. এম. মাসুদ

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৯
প্রধানমন্ত্রী ৪৯
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫০
আন্তর্জাতিক ৫১
উন্নয়ন ৫২
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৩
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
শিক্ষা ৫৪
বিনিয়োগ ৫৫
নারী ৫৫
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৬
কৃষি ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
স্বাস্থ্যকথা ৫৭
নিরাপদ সড়ক ৫৮
বিদ্যুৎ ৫৮
যোগাযোগ ৫৯
কর্মসংস্থান ৫৯
সংস্কৃতি ৫৯
চলচ্চিত্র ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬২
প্রতিবন্ধী ৬২
ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে
কথাসাহিত্যিক দিলারা হাশেম ৬৪

হাইলাইটস

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস: একটি অবিস্মরণীয় দিন

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে কুষ্টিয়া জেলার তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে স্থানটির নামকরণ হয় 'মুজিবনগর' এবং সেখানে শপথ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিতি লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে যখন মুজিবনগর অধ্যায়টি সংগঠিত হয়েছিল, তখন তিনি পাকিস্তানিদের কারাগারে। তাঁর নির্দেশনা ও ছক অনুসারেই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর নিরঙ্কুশ বিজয়ী আওয়ামী লীগের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করে তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকচক্র। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণে বাঙালি জাতি দিক নির্দেশনা পায়। এ ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা, সর্বোপরি ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণাতেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। তদুপরি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর সহকর্মীদের সত্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং এ সরকার পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক ও আইনগত বৈধতা।

মূলত ১০ই এপ্রিল মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী এলাকার মুক্তাঞ্চলে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এক বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। এই অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন ও বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত হয় বাংলাদেশ সরকার। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হয় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ও নির্দেশিত পথে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে এ সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধ দ্রুততম সময়ে সফল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয় বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয়।

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতা ও মুজিবনগর সরকার নিয়ে 'ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস: একটি পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা', 'বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ', 'কৃষিবান্ধব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা', 'বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা', 'বঙ্গবন্ধু: শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধু', 'মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা' ও 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে পৃ. ৪, ১০, ১৫, ১৭, ২০, ২২ ও ২৬

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : **এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস**
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদানের ভাস্কর্য: মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস: একটি পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য এক দিন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদিন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। পরে এ বৈদ্যনাথতলাকেই মুজিবনগর হিসেবে নামকরণ করা হয়। মুজিবনগর সরকার গঠনের ফলে বিশ্ববাসী স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামরত বাঙালিদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। জনমত সৃষ্টি, শরণার্থীদের ব্যবস্থাপনা ও যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণে মুজিবনগর সরকার যে ভূমিকা পালন করে, তা বাঙালির ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবগাথার স্বাক্ষর। মুজিবনগর সরকারের সফল নেতৃত্বে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালানোর পর একই বছরের ১০ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দেশবাসীর উদ্দেশে বেতারে ভাষণ দেন, যা আকাশবাণী থেকে একাধিকবার প্রচারিত হয়। এ ভাষণের মধ্য দিয়েই দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আইনানুগ সরকার গঠিত হয়েছে। আর ১৭ই এপ্রিল সকালে মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরদিন দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকায় শপথ গ্রহণের সংবাদ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণস্থল (মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা গ্রামের আম্রকানন)-এর নামকরণ করা হয় 'মুজিবনগর'। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ গর্ব আর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই নামকরণ করেছিলেন। তখন সরকারি নথিতে লেটার হেডে লেখা থাকত 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, মুজিবনগর'। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী।

মুজিবনগর শুধু ঐতিহাসিক স্থানই নয়, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্র গঠনের ভূমিও। যুদ্ধ করে বিজয়ী হওয়া প্রতিটি দেশের এমন একটা জায়গা থাকে, যেটি মানুষের আবেগের সঙ্গে যুক্ত। মুজিবনগর হলো বাংলাদেশের উৎপত্তিস্থল। মুজিবনগর থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের কথা কার্যত সারা বিশ্ব আনুষ্ঠানিকভাবে জানতে পারে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামের স্মৃতিচারণ–

> শপথ অনুষ্ঠানের নির্ধারিত স্থানে, অর্থাৎ বৃহত্তর কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে পৌঁছাতে বেলা ১১টা বেজে গেল। আমরা পৌঁছার পরপরই অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঝিনাইদহ মহকুমার পুলিশ প্রধান মাহবুব উদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার দেন। মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-ইলাহী

শপথ অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। আগেই ঠিক করা হয়েছিল, আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী শপথ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করবেন।

অনুষ্ঠানের জন্য ছোট্ট একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়। মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যরা, এম এ জি ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিলেন। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই স্থানের নাম 'মুজিবনগর' নামকরণ করেন। সাংবাদিকদের প্রধান প্রশ্ন ছিল সরকারের প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায়? জবাবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমরা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই মন্ত্রিসভা গঠন করেছি। তাঁর সঙ্গে আমাদের চিন্তার (বিস্তর) যোগাযোগ রয়েছে।'

আম্রকাননের অনুষ্ঠানে ভরদুপুরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী এলাকার হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। হাজারো কণ্ঠে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো' ইত্যাদি স্লোগান।

আমার কাজ ছিল দ্রুত অনুষ্ঠান শেষ করে (কলকাতা থেকে আনা) সাংবাদিকদের কলকাতা ফেরত পাঠানো। দুপুরের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। সাংবাদিকদের গাড়িতে করে ফেরত পাঠানো হলো। মন্ত্রিসভার সদস্যরা ফিরলেন সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের পর কলকাতায় ফিরে গিয়ে সাংবাদিকেরা বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সরকার গঠন সম্পর্কে সংবাদ পাঠাতে শুরু করলেন।

অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সেসময় মেহেরপুরের সাবডিভিশনাল অফিসার তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী।

২০১৯ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রচারিত বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জনাব চৌধুরী ঐ অনুষ্ঠান আয়োজনের নানা খুঁটিনাটি কথা জানান–

আমি এবং আমার বন্ধু মাহবুব, আমাদের সহযোগিতায় তাজউদ্দীন সাহেব এবং ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে আমরা সীমান্ত পার করে ভারতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই সুবাদে তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং পরের দিকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। আমরা টেলিফোনে কলকাতার সঙ্গে মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গার সংযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় যখন সরকার গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন আমাকে বলা হলো যে অতিসত্বর সরকার গঠন করা হবে, তোমাদের দিক থেকে একটা প্রস্তুতি নাও। ধারণা দেওয়া হলো যে ঐ এলাকাটায় এটি গঠিত হতে পারে।

কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তখন আমরা পিছু হটতে শুরু করেছি। পাকিস্তান আর্মি যশোর থেকে আক্রমণ শুরু করেছে, চুয়াডাঙ্গায় বম্বিং শুরু করেছে। আর্টিলারির সহায়তায় তারা বেশ অগ্রসর হচ্ছে। টেকনিক্যাল রিট্রিট বলতে যেটা বোঝায়, আমরা সেটা এর মধ্যেই শুরু করে দিয়েছি। এসব ঘটনার মধ্যেই আমাদের মাঝে মাঝে বলা হচ্ছে যে, তোমরা তৈরি থেকো, সরকার গঠন হতে পারে। এরকম সময়ে ১৫ই এপ্রিলের দিকে আমরা যখন মেহেরপুরে চলে এসেছি, তখন আমাকে খবর দেওয়া হলো যে একটা জায়গা তোমরা বাছাই করো। এমন একটি জায়গা বাছাই করতে বলা হয়েছিল যেখানে ভারত থেকে সহজেই ঢোকা যায়, যে এলাকা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে– বিশেষ করে আকাশ থেকে এবং বাংলাদেশের দিক বিবেচনা করলে একটু যেন দুর্গম হয়।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল চক্রবর্তী নামে বিএসএফের একজন কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বৈদ্যনাথতলার আমবাগানটি বাছাই করা হলো। সেখানে আমবাগান থাকায় আকাশ থেকে সহজে দেখা যায় না। মেহেরপুর থেকে ১০/১২ কিলোমিটার দূরত্বে হলেও রাস্তাঘাট নষ্ট থাকায় সহজে যাওয়া যায় না। আবার ভারত থেকে সহজেই সেখানে প্রবেশ করা যায়। পুরো বিষয়টির আয়োজন করা হয়েছিল খুবই গোপনে। কী হবে সেটা কাউকে বলিনি। তখন আমাদের সীমান্ত এলাকায় রেগুলার ইপিআর

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে ১৭ই এপ্রিল ২০২২ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন –পিআইডি

নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে আনসারের একটি ছোট কন্টিনজেন্ট রেখেছিলাম– সীমান্তের প্রতীকী নিরাপত্তার জন্য।

তাদের কাছে গিয়ে আমরা বললাম যে, ভারতের দিক থেকে কয়েকজন লোক আসতে পারে। এখানে একটা জায়গায় অনুষ্ঠান হতে পারে, তোমরা তাদের সাথে যোগাযোগ রেখো এবং যা বলে করো। পরে খবর পাঠানো হলো যে ১৭ই এপ্রিল তোমরা প্রস্তুত থেকো।

ঐ সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের মুখে পিছু হটে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার কৃষ্ণনগরে পৌঁছেন মাগুরার তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক ওয়ালিউল ইসলাম এবং পাবনার প্রশাসক নুরুল কাদের।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের খবর তাঁদের কাছেও পৌঁছেছিল। ওয়ালিউল ইসলামের স্মৃতিচারণ বিবিসির কাছে–

> তখন মেজর ওসমান চুয়াডাঙ্গা থেকে তার হেডকোয়ার্টার মেহেরপুরে নিয়ে গেছেন। চুয়াডাঙ্গায় কিছু বোমাবর্ষণ হওয়ায় তারা জায়গা বদল করেছেন। ওখানে দুই দিন থাকার পরে আমরা যখন ভারতে প্রবেশ করি, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। সেখান থেকে আমরা কৃষ্ণনগরে গেলাম– এটা ১৬ তারিখের কথা। নুরুল কাদের আমাকে বললেন, তুমি কাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে চলে এসো, কিছু কাজ আছে।
>
> আমি সাড়ে ৮টা-পৌনে ৯টার দিকে গেলে তিনি বললেন, নদীয়ার ডিএম (ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট) খুঁজছে, তুমি একটু কথা বলো। আমি ফোন করলে তিনি বললেন, দেখুন আমাদের কাছে খবর আছে, আমাদের কাছাকাছি বাংলাদেশের ভেতরে আপনাদের সরকার শপথ নেবে। তো, আপনারা যারা এখানে আছেন, তাদের পাঠিয়ে দেয়ার জন্য আমি অনুরোধ পেয়েছি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে সকালে।

বিবিসিকে তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী আরও জানান,

> স্থান নির্বাচনের পর তাদের অনুষ্ঠান আয়োজনের যাবতীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হলো। সেখানে আমরা ছোট একটা মঞ্চের মতো ব্যবস্থা করলাম। কাছাকাছি ভবেরপাড়ার একটি মিশনারি হাসপাতাল থেকে কিছু চেয়ারটেবিল নিয়ে আসলাম। ভারতীয় আর্মির কিছু লোককে যেতে দেয়া হলো, যাতে কোন বিমান হামলা হলে সেটাকে দমন করা যায়। আমাদের লোকজনকে নিয়েও একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলো, যাতে শত্রু আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করে সবাই নিরাপদে চলে যেতে পারেন। ঐ সময় যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গ্রামেগঞ্জে খুবই সীমিতভাবে আয়োজন করতে হয়েছিল। সকাল ৯টার সময় থেকে অনুষ্ঠানস্থলে আমন্ত্রিত অতিথিদের আসা শুরু হয়।
>
> কৃষ্ণনগর থেকে সেখানে গিয়ে ওয়ালিউল ইসলাম দেখতে পান, বৈদ্যনাথতলায় একটি মঞ্চ বানানো হয়েছে। মঞ্চে সাতটি বা আটটি চেয়ার ছিল, যার একটি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য খালি ছিল।
>
> সেখানে 'ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' পাঠ করলেন গণপরিষদের স্পিকার ইউসুফ আলী। তিনিই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এরপর আমরা ভেবেছিলাম ইপিআরের লোকজনকে দিয়ে একটা গার্ড অব অনার দেয়া হবে। কিন্তু মেজর ওসমানসহ ইপিআরের লোকজন তখনো সেখানে পৌঁছাতে পারেননি। তখন আমি বিকল্প সমাধান খুঁজতে বাধ্য হলাম। সেখানে আনসারের যে লোকজন ছিল, তাদের একত্রিত করে আমার বন্ধু মাহবুব– যে ঝিনাইদহের এসডিও ছিল। যেহেতু তার গার্ড অব অনার দেওয়ার প্রশিক্ষণ রয়েছে , তখন তাদের নিয়ে একটি রিহার্সাল দেয়া হলো। এরপরে তারাই গার্ড অব অনার দিলেন।
>
> গোটা সময়টা জুড়ে আমার মধ্যে একটা উদ্বেগ কাজ করছিল।
>
> সব সময় একটা ভয় ছিল কোন কারণে যদি পাকিস্তান আর্মি আক্রমণ করে বসে! তবে একটা আশার কথা ছিল যে, ওখানে আসতে হলে ভারতের আকাশসীমা হয়ে আসতে হয়– না হলে বিমান ঘুরতে পারে না। তাই একটা চেষ্টা ছিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবকিছু শেষ করে চলে যাওয়া। অনুষ্ঠানটি দীর্ঘায়িত করার কোন পরিকল্পনা ছিল না।
>
> ঐ আমবাগানটা খুব ঘন আমবাগান। অনেক পুরনো আমগাছ– গাছে গাছ লেগে ছাতার মতো হয়ে থাকে। দিনের আলো ঝিলমিল করছিল, আনন্দঘন উৎসবের মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল প্রকৃতিও যেন এটাকে সমর্থন দিচ্ছে, আর রূপকথার মতো অনুষ্ঠানটা শেষ হলো।

মুজিবনগরে নতুন সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট ছিল– সীমান্ত অতিক্রম করার পর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিদর্শক গোলক মজুমদার, তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মহাপরিচালক কেএফ রুস্তমজী তাঁদের আশ্রয়স্থলে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। কেএফ রুস্তমজী দিল্লির ঊর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হয় তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে নিয়ে দিল্লি যাওয়ার জন্য, উদ্দেশ্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাজউদ্দীন আহমদের বৈঠক।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের আগে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের কয়েক দফা বৈঠক হয়। এ সময় তাজউদ্দীন আহমদ উপলব্ধি করেন, সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারত সরকারের দৃঢ় সমর্থন ছাড়া বিশ্বের কোনো দেশই বাংলাদেশের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে না। এছাড়া ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের আগের দিন এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাজউদ্দীনের কাছে জানতে চান যে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে কোনো সরকার গঠিত হয়েছে কি না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে বৈঠকে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে নিজেকে তুলে ধরবেন। কারণ এতে পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে সাহায্য করার জন্য ৩১শে মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা কার্যকর রূপ লাভ করতে পারে বলে তাজউদ্দীনের ধারণা হয়। ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকের সূচনাতে তাজউদ্দীন জানান যে, পাকিস্তানি আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ২৬শে মার্চেই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে সরকার গঠন করা হয়েছে। সমাবেত দলীয় প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শক্রমে দিল্লির উক্ত সভায় তাজউদ্দীন নিজেকে প্রধানমন্ত্রীরূপে তুলে ধরেন। ঐ বৈঠকে তাজউদ্দীন আহমদ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য অনুরোধ করেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, উপযুক্ত সময়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এভাবেই বাংলাদেশ সরকারের ধারণার সূচনা।

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠক শেষে তিনি বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলে তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগের এমএনএ এবং এমপিএদের কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তে অধিবেশন আহ্বান করেন।

উক্ত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিপরিষদ এবং এমএনএ ও এমপিএগণ ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়। [সূত্র: উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ]

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সরকারের সাবেক সচিব, এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান

নববর্ষের কড়চা

প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান

এক

পহেলা বৈশাখে একদিন

আজকের সকালটা অন্যরকম। অন্যদিন এসময় স্কুলে যাই, মাস্টারের কাছে পড়া দেই, দুষ্টুমির জন্য মার বকা খাই, অতিথিরা এলে মুখ গম্ভীর করে প্রশ্ন করেন, 'খোকা, তোমার বাবা বাসায় আছেন?' তখন মনেই হয় না দিনটার মধ্যে কোনোও এলাজ-মোনাসিব কিছু আছে, আছে রং কিংবা আনন্দের শিষ্ট লেহাজের অবশেষ।

আর আজকের দিনটা দূর্বাঘাসের ডগার শিশিরের মতো, যেন সারা দিনই নীহার বিন্দু আর প্রভাতি আলোতে দুষ্টুমি চলছে বালার্ক শোভার আবেশী লহরী তুলে।

বাবা ঘুম থেকে উঠেই বললেন, রমনায় যাবি না?

অবাক হয়ে বলতে হলো, রমনায় কেন বাবা? বোকাবোকা ভাব নিয়ে তাকিয়েও থাকলাম বাবার দিকে। আরও বড়ো হলে হয়ত বলেই ফেলতাম, তোমাকে কী বিবেকানন্দয় পেয়েছে ? মানে বলতে চাও 'অধিশব, arise, and dream no more!... Be bold and face the Truth! Be one with it!'? তখুনি বড়ো আপা ছুটে এসে খবর দিলো, পাশের বাসার তুলিরাও যাচ্ছে বাবা, আর ঐ যে শিমুল তার দাদা এসেছেন শিমুলিয়া না ফতুলিয়া থেকে, তিনিও যাবেন বটমূলে, আমি কালই শুনেছি।

বাবা নরম করে ধমক দিয়ে বললেন, বোকা মেয়ে ওটা ফতুলিয়া নারে ফতুল্লা। মোগল নবরত্নের একজন; নাম ছিল ফতেহ উল্লাহ খাঁ। আমাদের দেশে এসেছিলেন প্রজাদের শস্যকর দেওয়ার সময় আর নিয়ম ঠিক করে দিতে। তাঁর নামেই তাঁর কাচারি জায়গাটার নাম হয়। উনি একটা মসজিদ বানিয়ে গেছেন সেখানে, লোকে বলে উনি ওখানেই থাকতেন আর বজ্রা করে ঘুরতেন। তিনি দরবারের মাথা হয়েও নওয়াবের দরবারে যেতেন না বরং সুবেদার, দেওয়ান তাঁরাই আসতেন তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য। তাঁর মর্যাদা ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতো।

ভেতরে ভেতরে আমরা তখন অস্থির, কখন বাবা নিয়ে যাবেন রমনায়! আর বাবা কি না জুড়লেন মোগলদের গপ্প। বাবা বললেন বলেই তো, নইলে কার ঠেকা ছিল, এতক্ষণ তো স্বপ্নে ওড়া শ্রেষ্ঠ পঙ্খিরাজের ঘোড়াটা আমার ঘুমের খাটে বাঁধাই ছিল। বড়ো আপাকে দিয়ে তাগাদা দেওয়ালাম, দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাবা তৈরি হও। সবাই আনন্দ করতে করতে বেড়িয়ে যাচ্ছে যে, চলো না।

শেষে তো বেরোলাম, কিন্তু হায়রে মানুষের কী ঠেলাঠেলি, ভিড়ের ভিড়, লোকে লোকারণ্য! পথে পথে বেলুনওয়ালাদের দোকান তার যে কী আকর্ষণ ! কিন্তু কাছে যেতে পারলে তো হয়! আর একটু দূরে মনে হলো সাদা বাতাসা, মণ্ডা আর গোলাপি রঙের মিঠাই শনপাপড়ি। খাবার আর খেলনার পসরার যেন প্রতিযোগিতা। আমার কাছে মনে হলো আনন্দ মেলা বুঝি এটাকেই বলে। দূরে কে একটা বাঁশি কিনে মজা করে একটা ফুঁও দিলো। বাতাসি বাঁশির বাতাসটা যখন প্যাক করে শেষ হয়ে যায় তখন বেশ মজাই লাগে। একটা শিশুর হাতে সেই বাঁশি দেখে আমি খুঁজতে লাগলাম বাঁশি কোথায় পাওয়া যায় আর তা সংগ্রহইবা করা যায় কীভাবে।

শিমুলের বোন হেনাকে মুখোশ কিনে মুখে দিয়ে ঘুরছে দেখতে পেলাম। ওর দাদাকেও একটা মুখোশ পরিয়ে খিলখিল করে হাসছিল সে। সেই হাসির শব্দেই চিনলাম ওকে। এতে কার না হিংসে হয় ! আমার তাই জিদ চেপে গেল আরও। ওকে ডাক দিয়ে আমার রাগটা বোঝাতে চাইছিলাম কিন্তু আমাকে অবাক করে সে একটা মজার খবর দিলো। ঝিলের ও পাশটায় নাকি পাকুন পিঠা আর পান্তাভাত বিক্রি করছে সানু আপাদের ক্লাবের সদস্যরা। আমরা ঘুরে ঘুরে মঞ্চের কাছে এলেও কিছুই দেখতে পেলাম না ভিড়ের জন্য। ওখানে ছায়ানট গান করে। ছায়ানটই নাকি এই রমনার মেলা জনপ্রিয় করেছে। ওরাই নাকি পহেলা বৈশাখ করছে সেই আইয়ুব খানের কাল থেকে। ওদের পাশাপাশি অন্যান্য গ্রুপ বা দলও গান করে, তবে ছায়ানটই মুখ্য দল। অন্যদের মধ্যে ছিল যেমন ফকির আলমগীরের দল। অবশ্য এখন আর তিনি নেই আমাদের এই গ্রহে। নববর্ষ তবু তাঁকে ভুলবে না।

রমনার বটমূলে ছায়ানটের শিল্পীদের সংগীত পরিবেশন

দুই

হে বৈশাখ

১। বৈশাখ চান্দ্রবৃত্তিক নক্ষত্র 'বিশাখা'র নামজাত মাস। এ রকম নক্ষত্র আরও এগারোটি আছে। যেমন– অশ্বনি, আষাঢ়া, মঘা, উত্তর ফাল্গুনি ইত্যাদি। তাদের নামেই আমাদের বাংলা মাসের নাম। যেমন বিশাখার নামে বৈশাখ। অগ্রহায়ণকে মনে করা হতো বৃত্তের প্রথম উদিত নক্ষত্র। হায়ণ মানেই বর্ষ, তাই অগ্রহায়ণ নক্ষত্রের উদয় লক্ষ্য করে বর্ষ-যাত্রা (নব বর্ষ) চিহ্নিত করা হতো। রাজা বাদশাহদের হুকুম মতে বা তাদের সিংহাসন আরোহণ কালকে স্মরণীয় করতে মাস গণনার ব্যবস্থা হতো। এভাবে শকদের কালে যে অব্দ গণনার ব্যবস্থা চালু ছিল, শশাংকের কালে বা রাজা গণেশের কালে সেটা ছিল তার থেকে ভিন্ন। তবে এদেশে বর্ষাগণন প্রথাটি যে আজকের নয়, সেটা 'সন' কথাটি থেকেই বোঝা যায়। এই শব্দটি বাংলাও নয়, ফারসিও নয় আর ইংরেজিতো নয়ই। তিব্বতিদের বঙ্গ আক্রমণের স্মারক এটি। তবে পরবর্তী ইতিহাস ভিন্ন, সে সংস্কৃতিও ভিন্ন। সেটা ১৫৫৬ সালের একটি কেন্দ্রীয় ঘোষণা এবং তার পরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিষয়।

২। আমাদের এখানে উল্লেখ রাখা দরকার, 'বৈশাখ' এবং 'বৈশাখি মাস' বা 'বৈশাখি দিন' প্রভৃতি হলো এক জিনিস। আর '১লা বৈশাখ' (অধুনা ১ বৈশাখ) হচ্ছে যাকে বোঝাচ্ছি 'হ্যাপি নিউ ইয়ার', মানে 'নববর্ষ'। এর সঙ্গে সম্পর্ক হলো ৫ই নভেম্বর ১৫৫৬-তে মোগল সম্রাট মহামতি আকবরের সিংহাসন আরোহণ এবং মোগল ও ইরানি জগতের 'নওরোজ'-এর সঙ্গে এবং পরে প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশের জয় কামনায় ১৯১৭-তে সারা ভারতবর্ষে এবং বিশেষত বঙ্গে পূজা দান বা হোমকীর্তনের সঙ্গে এবং এভাবে ১৯৩৮, ১৯৬৭-এর নানা জাতীয়তাবাদী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত দিনপঞ্জিকা সংস্করণ কালে ও স্বাধীনতার পর (চট্টগ্রামে লালদীঘির পাড় এবং ডিসি হিল ও শিল্পী রশীদ চৌধুরীর আয়োজনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শহিদমিনার চত্বরে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট আয়োজনে ঢাকার রাজপথ) শোভাযাত্রার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির সঙ্গেও।

এই অনুষ্ঠান যেমন সর্বজনীন তেমনি কালসূচক, ঋতুধর্মী ও কৃষিজীবন কেন্দ্রিক এবং লোকায়ত।

৩। ১লা বৈশাখের সাধারণ সাংস্কৃতিক দিক ছাড়াও রয়েছে এর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক। আমার এক নাতনি স্কুলছাত্রী এলি এবং তার বোন তুলিকে বাংলা নববর্ষের সাধারণ সাংস্কৃতিক দিকটাকে তাদের প্রজন্ম কীভাবে দেখে জিজ্ঞেস করলে এলি আমাকে তিনটা প্যারা লিখে দিলো, এখানে সেটা উল্লেখ করতে চাই–

ক) নগরজীবনে নববর্ষ: বর্তমানে নগরজীবনে নগর সংস্কৃতির আদলে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। এই দিন সকল শ্রেণির এবং সকল বয়সের মানুষ ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাক পরিধান করে। তরুণীরা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি, হাতে চুড়ি, খোঁপায় ফুল, গলায় ফুলের মালা, আর কপালে টিপ এবং ছেলেরা নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। এভাবে বর্ষবরণ প্রথাগুলো পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ ঐতিহ্য খানিকটা হলেও তাদের হাতে সংরক্ষিত হচ্ছে।

খ) অনুষ্ঠানমালা: তরুণ-তরুণীরা খুব ভোরে উঠে মঙ্গল শোভাযাত্রার উদ্দেশে বের হয়। নববর্ষের দিনে রমনার বটমূলে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে এবং আরও বিভিন্ন স্থানে খোলা মাঠে আয়োজিত সাংস্কৃতিক নানা আয়োজনে বিভিন্ন সংস্কৃতিপ্রেমীরা চারদিক থেকে এসে জমায়েত হয় এবং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এই দিনে পাহাড়িদের বৈসাবি এবং সাংগ্রাই উৎসবাদিতে

বৈচিত্র্যসহ প্রায় একই আনন্দ করে থাকে এই ভিন্নধর্মীজনেরাও।

গ) খাবার: বছরের নতুন দিনে শুভ যাত্রার খাবার হলো 'আমানি' এবং কাঞ্জির পানি। এইদিন রমনায় এবং আরও দু-একটি স্থানে বাঙালি পরিবারের (পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা এবং বিদেশস্থ বাঙালিরাও) অনেকেই শিশুদের নিয়ে পান্তা-ইলিশ, বেগুন ভাজা এবং বিভিন্ন ধরনের ভর্তা খেয়ে থাকে। এই বিশেষ আমানি খাবারের বিষয়টি এই দিনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

কিছু কিছু মানুষ যখন এই দিনে রমনায় যাওয়া নিয়ে সমালোচনামুখর, তখন এই দুটি কিশোরীর এই অনুভূতি বাস্তবিক বিস্ময়কর। নতুন প্রজন্মের মাঝে এই চেতনা এবং সাংস্কৃতিক ধারণার এই প্রসার দেখে আমরা সত্যি গৌরববোধ করতে পারি।

৪। বৈশাখের এই দিবসটি গ্রেগরি পঞ্জিকার মধ্য-এপ্রিলের একটি বিশেষ দিন। ঐতিহাসিক কারণে এই দিনটির প্রতি এক বিশেষ আবেগ বা নতুন আবেশ এবং অনুভূতি জন্ম নিলে তাকে ঘিরে নানারকম নন্দিত ধারণা ও ঐতিহ্যের সূত্র জন্ম নেয়। তখন থেকে জানা যায় নানা কথা, নানা ইতিহাস। তার সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ইতিকথা। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে শান্তিনিকেতনে শুধু বৈশাখ নয়, সব ঋতুতেই নানা উৎসব পালিত হতো। মনে হয়, মহাযুদ্ধকালীন কীর্তন ও গাজনের ধারা থেকেই শুরু হয় পহেলা বৈশাখের দিনে রবীন্দ্রসংগীতসহ নানা গীত ও পুঁথিভিত্তিক পালা এবং রাবীন্দ্রিক ঋতু নাট্য-পরিবেশনের ঐতিহ্য বা চৈত্র পরব (সংক্রান্তি) ও বছরের প্রথম দিবস পালনের শুভ প্রক্রিয়া। এখন ১লা বৈশাখ সর্বজনীন একটি দিবস। বাঙালিত্ব পরিচয়ের প্রতীক একটি দিন। আবালবৃদ্ধবনিতা মুখরিত পথসজ্জিত এবং গান ও আনন্দ অনুষ্ঠানপূর্ণ অনাবিল এক ঋদ্ধ দিবস।

৫। বাংলা সনের হিসাব গণনা শুরু হয় আকবর শাহের বঙ্গে প্রেরিত অর্থমন্ত্রী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজীর কর্মোদ্যোগ গ্রহণের সময় থেকে। তিনি ঢাকায় এসে নারায়ণগঞ্জের কাছে ফতুল্লাতে (তাঁর নামে নামাঙ্কিত) এক মসজিদ বানিয়ে তাতে তাঁর কর্মস্থান স্থাপন করেন। তাঁর কারণে আজ থেকে ৪৩৩ বছর আগে ১০ বা ১১ই মার্চ ১৫৮৪ থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়।

তিন

শুভদিনের উৎসব: বৈশাখের প্রবর্তনা

আমার একটা বইতে লিখেছিলাম, 'ফুল হয় শত শত ফল হয় বারো, পাকলি হয় কি, দেখি তবে কাজির বেটা, গুণতে পারো নি'।

এটা গুণতে কাজির বাড়ি যেতে লাগে না– এটাতো দিন মাস বছরেরই ধাঁধা। আর বছরটা শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তির পরে আমরা যাকে বলি ১লা বৈশাখের সুপ্রভাতে, শুভ সকালে। এই দিনের গুরুজনদের প্রবাদী আশীর্বচন হলো– 'দিয়ে গেলাম আশীর্বাদ/ খা বাছা ঘি-ভাত ॥' গুরুজনরা কত দোয়া-আশিস জানিয়ে থাকেন কনিষ্ঠদের কত কত উপলক্ষে, যেমন– বন্ধু বা সখা-সুহৃদ এবং প্রিয়জনেরাও পুষ্পোপহার দিয়ে থাকেন কত না শুভদিনে। এখন সামাজিকভাবেও এই রীতির প্রসার লাভ ঘটেছে। সম্প্রতি 'পদ্মশ্রী' উপাধিপ্রাপ্ত সনজীদা খাতুনের বিশেষ উদ্যোগে রমনার বটমূলে এক সময় নববর্ষের উৎসব গড়ে উঠেছিল আইয়ুবী শাসনের পরোয়া না করে। লোকে বলত, 'ক্ষেত আর পুতের আশায় কাটলো দুর্বহ যামিনি, আয়রে আজ গাই সবে ১লা বৈশাখের গায়োনি।' সেটাই তো ফসলি মাসের 'সিফনি'। তবে এই বৈশাখি গান এমনি এমনি গাওয়া সম্ভব হয়নি বাংলাদেশে। ২১-এর মতো, ২৫শের মতোই কত রক্ত নদীর ভেলা হয়ে এসেছিল এই বৈশাখি পয়লার পালা। হালখাতা, মঙ্গলকামনা, শুভদিনে শুভকাজ আরম্ভ করা, বাঁশ-বেতের খেলনা, রঙিন কাগজ আর সোলার জিনিস, বাহারি কাচের চুড়ি আর মণ্ডা-বাতাসা, খাগড়াই-মটকা আর গুড়ের খই, পাতার বাঁশি, ভেপু বাঁশি, চড়কি, বারুদের খেলনা বা নানারকমের বাজি (ব্যাঙবাজি, তারাবাজি ইত্যাদি) আর সেই পটচিত্র, বাঁদরনাচ, সাপখেলা, কামার-কুমার-কাঁসারুদের নানা দ্রব্য– কোথায় সেসব আজ? প্লাস্টিক বিশ্বায়ন কত কীই তো গিলে নিয়েছে আরও। তবু পঞ্জিকায় খেরো হালখাতা বিশাখা-নক্ষত্রের দিনটিকে ঠিকই চিহ্নিত করে রেখেছে আজও। চান্দ্র মাসের মহররমকেও যেমন সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম উল্লিখিত ফতেহউল্লাহ সিরাজীর গণনা মতে ৯৬৩ হিজরি মোতাবেক ১৫৫৬ ঈশায়ী সালের (১৫৫৬) সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের কাল ও মাস থেকে (মহররম মাস তৎকালে বাংলায় বৈশাখ মাস) ফসল আদায়ের মাস এবং সনের শুরু ধরা হয়। উল্লেখ্য, প্রচলিত সন হিসেবে মাসটি ছিল দ্বিতীয় মাস; এবং 'সন' কথাটি তখন বাংলায় চালু থাকার কারণ তিব্বতি সম্রাট সংস্রন; তিনি একসময় বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। বৌদ্ধদের কারণে তিব্বত জ্ঞান ও তীর্থস্থান ছিল বহুকাল। এখনও সেই ঐতিহ্য রয়েছে। চান্দ্রমাস ও নক্ষত্র সন থেকে সৌরবর্ষে সন গণনা শুরু হয় যখন বহিঃপৃথিবীতে সৌর ক্যালেন্ডার জনপ্রিয় হয় এবং সম্রাট আকবরের কানে তা পৌঁছালে তিনি যেমন 'সৌর ঘড়ি' (দিল্লি) স্থাপন করেন, তেমনি সৌর সনও প্রতিষ্ঠা করেন।

আকবরের প্রাসাদে 'নওরোজ' (নববর্ষ) পালিত হতো হিজরি সনের হিসাবে। মোগল ও নবাবী আমলের পরে বাংলায় ও ভারতে ইংরেজি সন ও সৌরবর্ষের হিসাবে জানুয়ারির প্রথম দিনটিকে বর্ষারম্ভ ধরা হতো। বাংলা মাসের হিসাবটা একাধিকবার সংশোধনের চেষ্টা হয়েছে পাকিস্তান আমলে। বাংলাদেশে তার সঙ্গে মাত্রা যোগ হয়েছে যেমন– ছায়ানট ও চট্টগ্রামের ডিসি হিলের স্বতঃস্ফূর্ত মহাসমারোহ তো আছেই, তার সঙ্গে পাচ্ছি তরুণ প্রজন্মের এসএমএস ও ই-মেইল প্রভৃতি নবপ্রযুক্তি ব্যবহারের আধুনিক উদ্যমসমূহ। থার্টিফার্স্টের বিকৃতির এ এক আশ্চর্য উত্তরণ।

আজ যখন 'নববর্ষ' এক আন্তর্জাতিক উদ্যম ও উৎসব, তার সময় ও প্রক্রিয়া যেমনই হোক, যেমন তা পানি-খেলায়ই হোক আর পান্তা খেয়েই হোক, শুভবাদই যখন তার লক্ষ্য, এ এক সাংস্কৃতিক অধিকার ও সংগ্রাম। ঝড়-বন্যার দেশ বাংলা চিরকালই সংগ্রামী জনতার বসতভূমি। তারা জানে 'খর নদীতে কখনও চড়া পড়ে না'। ১লা বৈশাখ তো তারই প্রতীক।

প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান এবং নজরুল ইনস্টিটিউটের সাবেক নির্বাহী পরিচালক

শুদ্ধাচার স্লোগান

নৈতিকতা ও সততা
জীবনে আনে পবিত্রতা

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ভাস্কর্য: মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স

বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ

জাফর ওয়াজেদ

বাঙালি জাতির উত্থান, বিকাশ, মুক্তি ও স্বাধীনতার এক মাহেন্দ্রক্ষণে রক্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সহস্র বছরের সাধনা শেষে বাঙালি জাতির রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আর সেই রাষ্ট্রকে দখলদার হানাদারমুক্ত করে স্বাধীন গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গঠন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বাঙালি জাতির জীবনে প্রথম নির্বাচিত সরকার। একাত্তর সালে বাঙালি জাতি তার আপন ভাগ্য গড়বার জন্য রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে নেমেছিল। সেই লড়াই পরিচালনা করেছিলেন বাঙালির প্রথম সরকার। মুজিবনগরে গঠিত হয় বলে এই সরকারকে মুজিবনগর সরকার হিসেবে অভিহিত করা হয়। একইসঙ্গে প্রবাসী সরকারও বলা হতো। কিংবা অস্থায়ী সরকারও ডাকা হতো। তবে ভিত্তিগতভাবে সরকারটি ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

১৯৭১ সালে ছিল বাঙালি জাতির জীবনের সর্বোচ্চ উত্থানপর্ব। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে বাংলাদেশের মানুষ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে জনগণকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রশাসন পরিচালিত হতে থাকে। দেশের মানুষ সেদিন একাত্ম হয়েছিল। সারা বিশ্ববাসী এই অসহযোগ আন্দোলনে জন-উত্থান দেখে স্তম্ভিত শুধু নয়, অভিবাদনও জানিয়েছিলেন সেসময়। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে কেবল সেনাছাউনি ছাড়া বাংলাদেশের সর্বত্র কার্যকর হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। বাঙালি তরুণ-তরুণীরা সেদিন সশস্ত্র প্রশিক্ষণে নেমেছিল। রাজপথ, জনপদ থেকে গ্রামবাংলা মিছিলের পদভারে কম্পিত হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানি শাসকরা প্রতারণামূলক আলোচনায় সময়ক্ষেপণ করে এবং শক্তিসঞ্চয় করে। ইয়াহিয়া খান তার সশস্ত্রবাহিনীকে লেলিয়ে দেয় বিশ্ব ইতিহাসের ঘৃণ্যতম অধ্যায় সংযোজনে। তারা ২৫শে মার্চ রাতে বাঙালি নিধনে গণহত্যা শুরু করে। গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেসে পাঠিয়ে দেন। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার পর সারা দেশে মানুষ অসম প্রতিরোধ যুদ্ধে এগিয়ে আসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে।

সীমান্ত পাড়ি দিয়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন, ৬ সদস্যের সরকার গঠন করে এবং বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। ১১ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে প্রাতিষ্ঠানিক ও শক্তভিত্তির ওপর সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজনে গঠিত সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করে ১৪ই এপ্রিল। স্থান হিসেবে মুক্তাঞ্চল চুয়াডাঙ্গা নির্ধারিত হয় এবং এই স্থানকে রাজধানী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। ওয়ারলেসে এই খবর পেয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ১৩ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় বিমান থেকে বোমা ও গুলি চালায় এবং শহর দখল করে নেয়।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা আমবাগানে শপথ নেয় বাঙালি জাতির প্রথম সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা। বাংলাদেশের পুলিশ ও আনসার বাহিনীর একটি দল মন্ত্রিসভাকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। স্থানীয় মিশনারি ছাত্রীরা জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' পরিবেশন করে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজকের অন্যতম ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম লিখেন, 'কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলো। একটি ছোট মঞ্চে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, ওসমানী, আবদুল মান্নান ও আমি। আবদুল মান্নান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই স্থানের নাম 'মুজিবনগর' নামকরণ করেন। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত মুজিবনগর ছিল অস্থায়ী সরকারের রাজধানী।'

শপথ গ্রহণের শুরুতেই ১০ই এপ্রিল গণপরিষদ সদস্যদের অনুসমর্থনদান করা স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়, তারই ভিত্তিতে পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। এই ঘোষণাপত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের চারটি মৌলিক নীতির উল্লেখ করা হয়েছিল। বলা হয় যে, নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সত্তরের নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরাই এই সরকার গঠন করে। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি,

তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং অপর তিনজনকে মন্ত্রিসভার সদস্য করে ৬ সদস্যের সরকার গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে মন্ত্রিসভাকে শপথ বাক্য পাঠ করান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম কেবিনেট সচিব এইচ টি ইমাম *বাংলাদেশ সরকার ৭১* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, '১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে, যে স্থানের কাছে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল, ঠিক সেই স্থানেই দুশো বছরেরও বেশি কাল পরে স্বাধীন, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সূর্যোদয় হলো– এর চাইতে আনন্দের আর গর্বের আর কী হতে পারে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং প্রধান সেনাপতি পতাকা উত্তোলন করলেন। সশস্ত্রবাহিনীর অভিবাদন (গার্ড অব অনার) গ্রহণ করলেন। দেশি-বিদেশি সাংবাদিকবৃন্দ, বিপুল সংখ্যক জনতা আর নেতৃবৃন্দ দেখে অভিভূত হলেন।' এই আনন্দ আর গর্বের মুহূর্তে তিনি সেখানে হাজির থাকতে না পারলেও (তখন আগরতলায় মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করছিলেন) যারা ছিলেন তাদের কাছে জেনেছেন– 'সে কী উত্তেজনা, উৎসাহ আর উদ্দীপনা, শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো।'

শপথ অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘোষণা করেন যে, 'বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে এবং পরিপূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলবে।' প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'লাশের পাহাড়ের নীচে পাকিস্তান এখন মৃত ও সমাহিত এবং এসব ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে ইয়াহিয়া ও তার সমর্থকরা অনেক আগে থেকেই দুই দেশের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল।' বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সামরিক সম্ভার যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ব্যবহার করছে তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি আজ রুখে দাঁড়িয়েছে।' তিনি গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রতি সাহায্যের আবেদনও জানান।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ও সরকারের প্রথম সচিব তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'নিজেকে মনে হচ্ছিল ধাত্রীর মতো। একটি দেশের জন্ম হচ্ছে। প্রত্যেক্ষ করছি।' বৈদ্যনাথতলায় ছিল ক্যাথলিক মিশন। এই মিশনের সিস্টার, ফাদারসহ শিক্ষার্থীরাও ছিল অনুষ্ঠানের দর্শক-শ্রোতা। সিস্টার ক্যাথরিন গনভালেজ শপথ গ্রহণের মঞ্চে টানানোর জন্য সুঁই-সুতা দিয়ে সেলাই করে লিখেছিলেন বাংলায় স্বাগতম এবং ইংরেজিতে ওয়েলকাম। তার নিচের লাইনে বাংলা ও ইংরেজিতে 'জয় বাংলা'। কাপড়ের ব্যানারটি মঞ্চের পেছনে আমগাছের উঁচু ডালের সঙ্গে টানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের দুই বাড়ি থেকে দুটি বড়ো আকারের চৌকি এনে মঞ্চ করা হয়। মিশনের চেয়ার-টেবিল ছিল দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও অতিথিদের বসার আসন। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কায় সেদিন সকালে অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান স্বল্পস্থায়ী ছিল। শপথ শেষে তাজউদ্দীন আহমদ দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এছাড়া বিশ্ববাসীর উদ্দেশে একটি দীর্ঘ বিবৃতির বাংলা ও ইংরেজি 'ভার্সন' সাংবাদিকদের কাছে বিতরণ করা হয়।

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে বাঙালি জাতির আনুষ্ঠানিক জন্ম হলো। সহস্র বছর ধরে নিষ্পেষিত, শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, ঘুমন্ত, হতাশাগ্রস্ত বিচ্ছিন্ন একটি জাতিকে একাত্ম করে বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিলেন। আর পশ্চাৎপদ জাতিকে জাগ্রত করে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের কঠিন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার প্রেরণাদাতা হলেন। ১৭ই এপ্রিল বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আর সেই দেশ পরিচালনায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জনগণের অভিপ্রায়ে গঠিত হলো সরকার। আইনানুগভাবে এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গঠিত রাষ্ট্র ও সরকার সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিলাভ করে ১৭ই এপ্রিল। আর বিশ্বজনমত ক্রমশ এই স্বাধীনতাকে সমর্থন করে বাংলাদেশের জনগণের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিল।

মুজিবনগর সরকার, অস্থায়ী সরকার বা প্রবাসী সরকার– যে নামই ডাকা হোক বা পরিচিতি লাভ করুক এই সরকারই বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এরপর মন্ত্রিসভায় কিছু পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত এই সরকারই ক্ষমতায় থাকে। নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করলে প্রথম বাংলাদেশ সরকার ছিল একটি সফল সরকার। প্রথম সাফল্য হলো, মাত্র ৯ মাসে বিজয় অর্জন করা। সাফল্য হলো বিশ্বজনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসা। সামরিক বিজয়ের আগেই কূটনৈতিক সাফল্যের সূচক হিসেবে ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতি অর্জন। বেতার কেন্দ্র চালু ও প্রচারণা, মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ, শরণার্থীদের দেখাশোনা, যৌথ সামরিক কমান্ড গঠনও এই সরকারের কৃতিত্ব। সরকারের ভেতর পাকিস্তানি ও মার্কিনি মনোভাবাপন্নদের নিষ্ক্রিয় রাখা, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য বিশ্বজনমত সৃষ্টিও এই সরকারের সাফল্য। বিশ্বের আর কোনো প্রবাসী বা যুদ্ধকালীন সরকারের সঙ্গে তুলনীয় নয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবটিও বিশ শতকে বাংলাদেশের।

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ মুক্তাঞ্চল মুজিবনগরে রচিত হয়েছিল বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক চরম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সহস্র বছরের গ্লানি শেষে জেগে ওঠা এক জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল ২৩শে জুন। আর ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল পলাশীর অদূরে আম্রকাননে বাংলার সূর্য আবার উদিত হলো। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতা বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত হলো। ১৭ই এপ্রিল একাত্তরেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, 'পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের সূচনা হলো তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তা মুছে দিতে পারবে না।' আর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে সৃষ্ট স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থাপিত হয়েছে এবং কোনো শক্তিই আর তা মুছে ফেলতে পারবে না।' না পারেনি, বাঙালির ইতিহাসের বাস্তবতাকে কোনোভাবেই মুছে ফেলা যায়নি গত পঞ্চাশ বছরেও। তাই মুজিবনগর দিবসের পঞ্চাশ বছর পরও বাংলাদেশ স্মরণ করবে সেই দিনটিকেও জন্মদিনের উচ্ছ্বাস, আবেগ ও বিহ্বলতায়। পাশাপাশি শোক আসে, যখন দৃশ্যমান হয়– মুজিবনগর সরকারের ৬ সদস্যের ৫ জনই নিহত হয়েছেন অপর ১ জনের সক্রিয় সহযোগিতা, পরিকল্পনা ও পরিচালনায়। তখন স্পষ্ট হয়, একাত্তরের পরাজিত শক্তি পঁচাত্তরে এসে সেই ইতিহাস জন্মদানকারী সরকার ও তাঁর নেতৃত্বকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। কিন্তু জাতির হৃদয় ও মনে তাঁদের স্মৃতি অমলিন। তাই আজ ৫১ বছর পরও ধ্বনি জাগে কণ্ঠ থেকে 'জয় বাংলা'। মুজিবনগর সরকারও এই উচ্চারণ করেছিল সেদিন। বাঙালি দর্পণে নিজের মুখ যদি অবলোকন করে, তবে দেখবে, পরাজিত শক্তির আস্ফালন ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু এরা ধোপে টিকবে না অতীতের মতোই।

জাফর ওয়াজেদ: কবি, প্রাবন্ধিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ বনাম মার্কিন সপ্তম নৌবহর

খালেক বিন জয়েনউদ্‌দীন

উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো একাত্তর সাল পর্যন্ত বাঙালির কেটেছে পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আন্দোলন ও স্বাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে। তখন এ বাংলার মানুষ পাকিস্তান নামক একটি দেশের উপনিবেশ, প্রথমে পূর্ব বাংলা পরে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা। এর আগে ব্রিটিশদের তাড়ানোর জন্য হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছিল। প্রাণদান করেছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশপ্রেমিক মানুষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা বুঝতে পারল তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হিন্দু-মুসলিম মিলিত শক্তির কাছে নয়। বিভেদ সৃষ্টি করল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। বঙ্গ দুই ভাগ হলো, আবার আন্দোলন-সংগ্রামে এক হলো, তবুও ব্রিটিশদের চক্রান্তের শেষ নেই। ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের শক্তিকে বিভাজন করে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো। আমাদের বাপ-দাদারা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা পেলেন। আমরা হলাম সেই স্বাধীনতার নামে সর্বক্ষেত্রে নিগৃহীত। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলনেই বোঝা গেল পাকিস্তানিদের দ্বিজাতিতত্ত্বের আসল উদ্দেশ্য। দ্বিজাতিতত্ত্বের মোহ কাটল। এ অঞ্চলের ভাগ্যাহত মানুষ বুঝতে পারল স্বাধীনতার নামে ঘাড়ে চেপে বসেছে জিন্নাহর ভূত তথা পাঞ্জাবি চক্র। তারা প্রথমেই শুরু করল পূর্ব বাংলার মানুষকে শাসনের নামে শোষণ-নির্যাতন ও অর্থনৈতিকভাবে অর্থ-সম্পদ অপহরণ। এভাবেই পাকিস্তানিদের যাত্রা। বাঙালির প্রথম জাগরণ ঘটে ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে। বাহান্নতেও তাই। তারপর চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বিজয়। প্রদেশে ও কেন্দ্রে শেরেবাংলা, আবুল হোসেন, আতাউর রহমান খান ও সোহরাওয়ার্দীর সরকার গঠনে নানাবিধ চক্রান্ত এ অঞ্চলে মানুষের ক্ষমতা থেকে অপসারণ। এরপর পাকিস্তানিদের বন্দুক দিয়ে দেশ শাসন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত।

১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে এবং এর পূর্বে পশ্চিম বাংলার কলকাতায় ও ঢাকায় একজন তরুণের আবির্ভাব ঘটে। যিনি সুভাষ বসু, আবুল হাশিম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এমনকি শেরেবাংলার চিন্তা ও দর্শনে তাঁর তারুণ্যের স্ফুরণ ঘটান এবং বাঙালির অধিকার হরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। হ্যাঁ, তিনিই সেই ফরিদপুরের দক্ষিণভাগের জলেডোবা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া নামক গ্রামের মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের শিক্ষিত যুবক, যাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। চুয়ান্নর পরে সবাইকে ডিঙিয়ে বাঙালির স্বরাজ আন্দোলনে এই যুবকটিই হয়ে উঠলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা ও পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রধান নেতা। তিনি নেতৃত্ব দিলেন ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনের আগে ১৯৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনে। ১৯৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মুখ্য বিষয় শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। তখন রাজনৈতিক মাঠে কেবলমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই পাকিস্তানিদের প্রধান শত্রু। এ কারণে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে জীবনের ১৪টি বছর।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের উভয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের দল তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় ঘটে। তখন পাকিস্তানের ক্ষমতায় সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া। ইয়াহিয়া বাঙালির বিজয় মেনে নিতে পারেনি। বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নানা ষড়যন্ত্র ও কূটনীতির মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতার স্পৃহা দমনের জন্য পূর্ব বাংলার গণহত্যা শুরু করে ২৫শে মার্চ। পাকিস্তানিরা ১৯৬৯ থেকেই বাঙালি হত্যা শুরু করেছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে টিক্কা খানের মাধ্যমে চূড়ান্ত অভিযান। আর সেই বাঙালির রক্তঝরা মুহূর্তে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত্রেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা ইপিআরের ওয়ারলেস কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতা ঘোষণা ঐ ২৬শে মার্চ প্রথমে রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম (আগ্রাবাদ) ও বেলাল মোহাম্মদ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (কালুর ঘাট) থেকে প্রচারিত হয়।

এরপর শুরু হয় বাঙালির পাকিস্তানি সৈন্য রোখার প্রতিরোধ। এক পর্যায়ে সত্তরের নির্বাচনে বিজিত সদস্যদের সর্বসম্মতিতে ১০ই এপ্রিল গঠন করা হয় যুদ্ধকালীন সরকার। এই সরকারই হানাদার পাকিস্তানি সৈন্য হটানোর লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। তাঁরা প্রথমেই ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা জানিয়ে প্রকাশ্যে শপথ নেন। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন পাকিস্তানে বন্দি বঙ্গবন্ধু। উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। এই সরকার দেশটিকে ১১টি অঞ্চলে ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরি করে। এসময় বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সহায়তায় আমাদের পাশে দাঁড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রশ্নে পৃথিবীর পরাশক্তি দুই ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ পাকিস্তানিদের পক্ষে, আর এক ভাগ বাংলাদেশের পক্ষে।

বাংলাদেশের পক্ষে পরাশক্তি রাশিয়াসহ ভারত, ভুটান, পোল্যান্ড এবং গোটা বিশ্বের বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, মিশর, ভিয়েতনাম, ইরাক ও সিঙ্গাপুরের জনগণ। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ সৌদি আরব, জর্ডান, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও তুরস্ক বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানকে সর্বপ্রকার সাহায্য করে। এভাবে বিশ্ব বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জন্য বিভাজিত হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা যুদ্ধ নতুন মাত্রা পায় মুজিবনগর সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে। সরকারের প্রবাসী দপ্তর স্থাপিত হয় কলকাতায়। এ সময় পাকিস্তানি

সৈন্যের অত্যাচারে প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয় শরণার্থী হিসেবে। ভারত আশ্রয়, খাদ্য, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করে। আমাদের পাশে দাঁড়ায় মিত্রমাতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দেশের অভ্যন্তরে হানাদার বাহিনী আর তাদের দোসর রাজাকার, আলশামস ও আলবদর বাহিনী। আর শান্তি কমিটির নামে অশান্তি কমিটি। মুসলিম লীগ ও জামাতের সদস্যরা পাকিস্তান রক্ষায় তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সৃষ্টি করে দালাল বাহিনী। গোলাম আজমরা টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বাঙালি নিধনে মেতে ওঠে। সমগ্র বাংলাদেশকে তারা তছনছ করে দেয়। হত্যা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ। ইজ্জত লুণ্ঠন করে মা-বোনদের।

স্বাধীনতার সেই যুদ্ধে অংশ নেয় এ দেশের মানুষ, যারা স্বাধীনতাকামী, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার পরে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিকসহ ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরাই সরাসরি মুজিবনগর সরকারের অধীনে সেক্টরে সেক্টরে যোগ দেয়। গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনী তথা গেরিলা বাহিনী। আতাউল গণির অধীনে এ বাহিনী সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। জুন-জুলাইয়ে মুক্তিবাহিনীর সরাসরি যুদ্ধ শুরু হয়। নভেম্বরেই পাকিস্তানি বাহিনী নাস্তানাবুদ হতে শুরু করে। আমাদের আক্রমণ তীব্রতর হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামগঞ্জ ছেড়ে জেলা সদর তথা খাদ্য গুদামে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, যশোর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, দিনাজপুর, রাজশাহীতে চলে সাড়াশি আক্রমণ। টিক্কা খানের বদলে নিয়াজী তখন এ অঞ্চলের পাকিস্তানি অধিনায়ক। ভারতের নিষেধাজ্ঞার কারণে পাকিস্তানি সৈন্যের রসদও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা বন্ধ।

ইয়াহিয়া খানও বুঝতে পারে সাধের পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিখণ্ড হচ্ছে। বাধ্য হয়েই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কাছে হাত পাতে। শ্রীলঙ্কা ও জর্ডান সরাসরি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিজ্ঞা করে যথাসময়ে বাংলাদেশের বড়ো মিত্র ভারতকে সমুচিত শাস্তি দিবে। দেখে নেবে রাশিয়াকেও। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ তখন গোটা বিশ্বের আলোচ্য বিষয় এবং বিশ্বের সকল গণমাধ্যম, বেতার ও পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের পক্ষে। একাত্তরের ৯ই আগস্ট ভারত ও রাশিয়া একটি শান্তিচুক্তিতে দুই দেশের বন্ধুত্ব দৃঢ় করে এবং দুই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। চিরকালের শত্রু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মেলায় চীন। এভাবেই চলে আসে ডিসেম্বর মাস। ডিসেম্বরের শুরুতেই আমাদের মুজিবনগর সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে যৌথ সামরিক কমান্ড গঠনের চিন্তাভাবনা করে। তেসরা ডিসেম্বর গঠিত হয় শত্রুবাহিনী পরাস্ত করার লক্ষ্যে পূর্বাঞ্চলীয় যৌথ কমান্ড। এই কমান্ডের অধিনায়কের দায়িত্ব পান ভারতের জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। আর এদিনই পাকিস্তান বাহিনী ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ চালিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পূর্বাঞ্চল তো পাকিস্তানিরা আগেই দখল করে নিয়েছিল। শুরু হয় তখন ভীষণ যুদ্ধ। পাকিস্তানিদের এই যুদ্ধের পেছনে একটি কৌশল ছিল– দু-এক দিন যুদ্ধ চলার পর জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কার্যকর করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে থামিয়ে দেওয়া। আমাদের সৌভাগ্য রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগে তা ভেস্তে যায়। যুক্তরাজ্যও এই সময় ভোট প্রয়োগ না করে পরোক্ষভাবে আমাদেরই সমর্থন জোগায়।

প্রস্তাবে রাশিয়ার ভেটো দেওয়ায় সাধারণ পরিষদে ইয়াহিয়ার প্রতিনিধি জুলফিকার আলী ভুট্টো ফাইলপত্র ছুড়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এই সময় পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রন্টে তুমুল যুদ্ধ চলছে। পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানিদের হামলার সমুচিত জবাব দেয়। আর পূর্ব ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ২/৩ দিনের মধ্যেই যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। টাঙ্গাইল, আখাউরা ও নরসিংদীতে নামে ছত্রী বাহিনী। বাংলাদেশের সমস্ত সীমান্ত এলাকা মুক্ত হয়। যশোর সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানিরা পালিয়ে যায় ৭ই ডিসেম্বর, তখন আমি সেনানিবাসের এইচ কিউতে বন্দি ছিলাম। ঐ সময় ঢাকার আকাশ মুক্ত হয় মিত্রবাহিনীর বিমান আক্রমণে। তারা আকাশ থেকে বোমা ফেলে তেজগাঁও বিমানবন্দরের রানওয়ে নষ্ট করে দেয় এবং গভর্নর হাউজে বোমা ছুড়ে গভর্নর মালিককে পদত্যাগে বাধ্য করে। মালিক তার মন্ত্রীদের নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা জোন হোটেল ইন্টারকনে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

এই সময় অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর সকল প্রচারমাধ্যমে একটি খবর প্রচারিত হয়। খবরটি হলো– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে না পেরে ভারত ও বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার জন্য পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধজাহাজ সপ্তম নৌবহর 'এন্টারপ্রাইজ' পাঠাচ্ছে। প্রথম তারা ঢাকায় অবস্থানরত মার্কিন নাগরিক উদ্ধারের কথা বলে। সপ্তম নৌবহর আসছে শুনে পাকিস্তানি দালালরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ঘটে অবাক কাণ্ড। খবর শুনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক ড. মীর ফকরুজ্জামান (টিক্কা খানের বন্ধু) মিলাদসহ ছাগল-গরু জবাই করে কাঙালি ভোজের আয়োজন করে। এই লোকটি ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল নায়ক। তখন এই মীর জগন্নাথ হলের নাম পালটিয়ে টিক্কা খান হল নামকরণ করে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরের মধ্যেই আমরা সপ্তম নৌবহরের কথা ভুলেই গেছি। সপ্তম নৌবহর রাশিয়া 'রণপোত' পাঠানোয় আর বঙ্গোপসাগরে ধাবিত হয়নি। মীর ও ইয়াহিয়ার খায়েশও পূরণ হয়নি। চীনও সেনা পাঠায়নি ভারত সীমান্তে। অগত্যা বাংলাদেশে মৃত্যুর

হাত থেকে বাঁচার জন্য ইয়াহিয়ার নির্দেশে নিয়াজী সদলবলে ঢাকায় প্রকাশ্যে ৯০ হাজারের অধিক সৈন্যসামন্ত নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু সপ্তম নৌবহরের কী হলো? কী প্রেক্ষাপটে মার্কিনিদের এই যুদ্ধজাহাজগুলো থমকে গেল– তার ইতিহাস জানার কৌতূহল আজও বাঙালিদের মেটেনি। তখন ঢাকার শ্রাবণ থেকে প্রকাশিত *১৯৭১: বিদেশি গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ* শীর্ষক গ্রন্থ থেকে এ সম্পর্কিত কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি–

> একইভাবে আমেরিকান নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে, সব ধরনের গোপনীয়তা রক্ষা করে জর্ডানকে সরবরাহকৃত অত্যাধুনিক আমেরিকান জঙ্গিবিমান হতে ৮-১০টি বিমান ইরানের শাহ'র মাধ্যমে পাকিস্তানে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে থাকেন– They determinedly kept their actions in the shadows, circumventing normal State Department communications by using a back channel between Nixon and the Shah of Iran, Muhammad Reza Pahlavi. Nixon, reassured that the U.S. ambassador in Tehran was oblivious, was delighted: 'Good, well we'll have some fun with this yet. God, you know what would really be poetic justice here is if some way the Paks could really give the Indians a bloody nose for a couple of days.' The next day, the Shah agreed to a U.S. request to send Iranian military equipment to Pakistan, with the United States replacing whatever Iran sent.
>
> Jordan also got a request from Yahya, for eight to ten sophisticated U.S. made F-104 Star fighter fighter-interceptors. King Hussein seemed keen to move his squadrons, but, fearing congressional wrath, did not want to act without express approval. When he nervously asked the U.S. embassy in Amman for advice, the diplomats balked. Kissinger noted with exasperation that these U.S. officials were lecturing the king of Jordan that it would be immoral to get involved in a faraway war; these diplomats had not conceived of the last-ditch possibility of using Iran and Jordan to provide U.S. weapons to the tottering Pakistani military. কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সে সদিচ্ছা আর পূর্ণতা পায়নি। সে সময় বিষয়টি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু কর্তাব্যক্তি কর্তৃক নিক্সনের ওই অবৈধ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়– On December 6, in the war's early days, Kissinger for the first time proposed the operation in a Situation Room meeting-not mentioning that the president had already made up his mind, and that the Iranians were already acting. But a State Department official immediately warned Kissinger that transferring Jordanian weapons to Pakistan is prohibited on the basis of present legal authority. এত বিরোধিতা ব্যর্থতার পরও নিক্সন-কিসিঞ্জার জুটি হাল ছাড়েননি। পতনোন্মুখ পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য শেষ উদ্যোগ হিসেবে বে অব বেঙ্গলের দিকে সপ্তম নৌবহর প্রেরণের নির্দেশ দেন। সে অস্ত্র হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে, বঙ্গোপসাগরে টাস্কফোর্স বা সপ্তম নৌবহর পাঠানোর জন্য এডমিরাল মুরারকে নির্দেশ দেওয়া এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিয়ে বল প্রায়োগিক কূটনীতির ব্যবহার করতে আসে। বলা বাহুল্য বাংলাদেশের মূল ঘটনাবলির প্রতিই মার্কিন টাস্কফোর্সের লক্ষ্য ছিল। ৬ই ডিসেম্বর ভিয়েতনামের টংকিন উপসাগরে অবস্থানরত নৌবাহিনীর কয়েকটি জাহাজের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স ৭৪ গঠন করা হয় এবং ১০ই ডিসেম্বর এই বহর সিঙ্গাপুরে পৌঁছে। ১২ই ডিসেম্বর টাস্কফোর্সকে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু ইতঃপূর্বে রাশিয়া ভ্লাদিভস্তক ৬-৭ তারিখের মধ্যেই ভারত মহাসাগরে রণপোতের প্রথম টাস্কফোর্স পাঠিয়েছিল এবং সপ্তম নৌবহরকে যথারীতি মোকাবিলার জন্য রাশিয়া দ্বিতীয় টাস্কফোর্স পাঠায়। এমতাবস্থায়, মার্কিন সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগর হতে ফিরিয়ে নিতে হয়।
>
> সম্পূর্ণ টাস্কফোর্সটি পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং এর নেতৃত্ব দানকারী পারমাণবিক জাহাজটির নাম ছিল 'এন্টারপ্রাইজ'। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সপ্তম নৌবহরটি আক্রমণাত্মক শক্তি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের দিকে তীব্র গতিতে ছুটে এসেছিল। এই টাস্কফোর্স বা সপ্তম নৌবহরে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইউ এস এস এন্টারপ্রাইজ, এটি ছিল ৭৫ হাজার টনের বিশাল ভারবাহিত জাহাজ, যা ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধজাহাজ এবং যে জাহাজটি ৫৭ দিনে ত্রিশ হাজার মাইল পুনঃতেল গ্রহণ ব্যতীত একটানা চলতে পারে। এটি আটটি অটোমেটিক রিঅ্যাকটরস শক্তিসম্পন্ন। এর চারটি গিয়ার বাষ্পীয় টারবাইন ৩৫ নটস পর্যন্ত চলতে সক্ষম। স্বাভাবিকভাবে ২৮৭০ জন পারসোন্যাল সত্ত্বেও জাহাজটি আরও ২ হাজার লোকসহ ১০০টি বিভিন্ন ধরনের বিমান বহন করতে পারত। এই জাহাজের সঙ্গে ছিল 'ত্রিপোলি', যা ছিল এমফিবিয়ান অ্যাসল্ট শিপ। ছিল গাইডেড মিসাইল সজ্জিত 'কিং, তিনটি গাইডেড মিসাইল সজ্জিত ডেস্ট্রয়ার; ডেকাটুর, পারসনস এবং টারটার শ্যাম। 'দি ত্রিপোলি' ছিল ১৭ হাজার ১০ টনসম্পন্ন একটি বড় ধরনের এমফিবিয়ান অ্যাসল্ট জাহাজ। এই জাহাজটি বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল যাতে ২৪টি মাঝারি, ৪টি বড় এবং ৪টি পর্যবেক্ষক হেলিকপ্টার বহন করতে সক্ষম। এটি ২১০০ জন অফিসার ও নৌ সেনাসহ একটি নৌব্য ব্যাটেলিয়নকে অস্ত্রশস্ত্র, কামান, যানবাহন এবং অন্যান্য উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করার ক্ষমতা বহন করত। 'দি কিং' গাইডেড মিসাইল দ্বারা সজ্জিত ছিল। এটি ভূমি থেকে শূন্যে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র এবং টর্পেডো দ্বারাও সজ্জিত ছিল। অনুরূপভাবে ডেস্ট্রয়ার, টারটার এবং ডেকাটরও ভূমি থেকে শূন্যে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত ছিল এবং যা অত্যাধুনিক পারমাণবিক উপকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ।

মার্কিন সপ্তম নৌবহর ও রাশিয়ার রণপোত (ডুবজাহাজ) মুখোমুখি হলে বিশ্বে তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ফলে আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি বিলম্বে ঘটত। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা লাভ করতামই। একাত্তরের মিত্রমাতা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও তাই বলেছেন, 'আমরা সহায়তা না করলেও বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করতো'।

আমাদের একাত্তরের শত্রুরা নিপাত যায়নি। স্বাধীনতার ৫০ বছরেও তাদের ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল আমরা লক্ষ করছি। বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে স্থির লক্ষ্যে। বঙ্গবন্ধুর সেই লক্ষ্য পূরণ করছেন তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা। স্বাধীনতার এই পরম মুহূর্তে আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রসৈনিক ভাইদের। স্মরণ করছি অংশগ্রহণকারী স্বাধীনতাকামী ভাইবোনদের। জয় বাংলা।

খালেক বিন জয়েনউদ্দীন: সাহিত্যিক, গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

কৃষিবান্ধব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম

বঙ্গবন্ধুর ত্যাগী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, কামার, কুমারসহ খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মুক্তি। অভাবী, স্বপ্নহারা মানুষগুলোকে মর্যাদা দিতে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে লড়েছেন বঙ্গবন্ধু। বৈষম্য ও শোষণে বাংলার মানুষের উন্নয়ন যাত্রার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা।

কবি রাজিয়া খাতুন চৌধুরানীর কাছে কৃষক সবার চেয়ে বড়ো সাধক–

> সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা
> দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা

গ্রামের উন্নয়নে মিলবে দেশের সত্যিকার উন্নয়ন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি ভাষণে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য, 'গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের মূল কেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে।' এসময় কৃষিবিদগণকে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদানের কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু। তাই বিশেষ এ দিনটিকে পালন করা হয় কৃষিবিদ দিবস হিসেবে ।

কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল প্রত্যয়। কারণ কৃষকগণই দেশের আসল নায়ক, তারাই দিনান্ত পরিশ্রমে, রোদে পুড়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সবার খাবার জোগান। বঙ্গবন্ধুর কাম্য ছিল সবুজ বিপ্লব। সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়নে কিছু সমস্যাও চিহ্নিত করেছিলেন। সেগুলো হলো– বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, সার, বীজ, কীটনাশক নিয়ে সমস্যা। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে প্রথমে চেয়েছেন যথাযথ জরিপ করতে। কারণ তিনি জানতেন জরিপ ছাড়া কোনো পরিকল্পনাই বাস্তবে আলোর মুখ দেখে না। জমির বিভাজন রোধ করে খামার গড়বার বিপুল বাসনা ছিল জাতির পিতার। তাই সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য শুধু কৃষিপণ্য নয়, সঙ্গে গবাদিপশু, মাছ, পরিবেশ সব কিছুরই সমন্বয় প্রত্যাশা করেছেন।

কর্মকর্তা হয়ে দপ্তর নির্ভরতা নয়, বঙ্গবন্ধুর চাওয়া ছিল তারা কাজ করবেন মাঠে-ঘাটে। কৃষিবিদগণের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আপনারা যারা কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন আপনাদের গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সাথে মিশে যেতে হবে, মনোযোগ দিতে হবে তাদের কর্মের ওপর, তবেই তারা সাহসী হবে, আগ্রহী হবে, উন্নতি করবে। ফলবে সোনার ফসল ক্ষেত ভরে।' কৃষিজীবীগণকে শহরমুখী না হবার আহ্বান জানিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আপনারা এখন শহরমুখো হওয়ার কথা ভুলে যান। গ্রাম উন্নত হলে দেশ উন্নত হবে, তখন আপনারা আপনা আপনি উন্নত হয়ে যাবেন।' খাদ্য বলতে বঙ্গবন্ধু অনেক কিছুকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'খাদ্য বলতে শুধু ধান, চাল, আটা, ময়দা আর ভুট্টাকে বোঝায় না, বরং মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শাকসবজি এসবকে বোঝায়। সুতরাং কৃষিতে উন্নতি করতে হলে এসব খাদ্যশস্যের সমন্বিত উৎপাদন উন্নত করতে হবে। কৃষক বাঁচাতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে, তা না হলে বাংলাদেশ বাঁচতে পারবে না।'

কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি ছিল বঙ্গবন্ধুর। ১৯৭২-১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেট ছিল পাঁচশো কোটি টাকা। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু কৃষিতেই দিয়েছিলেন ১০১ কোটি টাকা। এ তাঁর কৃষির প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ছিল খাদ্যই মূল, খাদ্য নিরাপত্তা বিধান করা গেলে সব উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর হবে। আর খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে না পারলে উন্নয়ন কার্যক্রম বৃথা যাবে। এ কারণেই পরমুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করতে হবে নিজেদেরই। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুনঃসংস্কার, উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে ইতিবাচক অনেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। এজন্য তিনি কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা বিস্ময়কর। কৃষি, শিক্ষা, সার ও সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, কৃষিতে ভরতুকি, সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ, বালাই ব্যবস্থাপনা, মিল্ক ভিটা পুনর্গঠন, নতুন সার কারখানা তৈরি, সার, সেচ, বীজ বিষয়ক কার্যক্রম, ভেঙে যাওয়া অর্থনীতি পুনর্গঠন বিষয়ক কর্মে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। গরু দিয়ে হালচাষ, গরুর গোবর সার হিসেবে প্রয়োগ করে উর্বরতা বৃদ্ধির তাগিদ দিয়েছেন। বালাইনাশকের ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতনতার কথাও বলেছেন। বালাইনাশক কারখানা তৈরি ও সুষ্ঠু ব্যবহারে গুরুত্বারোপ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর তাগিদ– 'নিজেরা বীজ উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে শুরুতে বিদেশ থেকে মানসম্মত বীজ

আমদানি করে দেশের বীজের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে হবে। পরে আমরা নিজেরাই মানসম্মত উন্নত বীজ উদ্ভাবন, উৎপাদন করব।'

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্য ও শোষণে বাংলার বিপর্যস্ত অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি ঘাতকদের সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপ থেকে সমৃদ্ধি অর্জনের পথ হিসেবে দ্বিতীয় বিপ্লব সাধন করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। মাত্র তিন বছরে তাঁর দূরদর্শী ও মেধাশীল কর্মে বাংলাদেশের চরম সাফল্য এসেছে। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে ছিল– সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা; কৃষি খাতে ভরতুকি প্রদান করে বিনামূল্যে কীটনাশক, সার ও সেচ যন্ত্রাংশ সরবরাহ; কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মাফ করে দেওয়া; ১০০ বিঘার উপরে জমি রাখাকে নিরুৎসাহিত করা।

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পিতার উদ্দীপনামূলক উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণ করে কৃষিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। স্বাধীনতার ৫০ বছরে প্রায় ৩০ শতাংশ আবাদি জমি কমে যাওয়ার পরও ফসলের উৎপাদন বেড়েই চলেছে। ১৯৭২-এর ১.১০ কোটি মেট্রিক টন থেকে শেখ হাসিনার পদক্ষেপে দানাদার ফসলের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩.৫৮ কোটি মেট্রিক টনে। এমনটা সম্ভব হয়েছে কৃষিবান্ধব কৃষি ব্যবস্থার জন্যই। কৃষি ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তার মূলে আছে নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ, গবেষণা ও বাস্তবায়ন। তাঁর যুগান্তকারী পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম–

- সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান, সার ও কৃষি উপকরণে ভরতুকি অব্যাহত রাখা
- কৃষি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি সাধন
- জাতীয় বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা
- ব্যাংকের ঋণ প্রদান সহজকরণ
- বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও বীজ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
- আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন, সহজে ঋণ প্রদান, অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ
- ভূমিহীনদের মাঝে খাসজমি বণ্টন। লক্ষ লক্ষ গরিব মানুষকে ঘর প্রদান
- প্রোটিনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন
- সার উৎপাদনে ফসফরিক এসিডের শুল্ক কর মওকুফ করা
- মুক্ত জলাশয়ে ব্যাপক মাছের পোনা অবমুক্তকরণ
- পশু প্রতিপালনের ও খামার ব্যবস্থা জোরদার
- ব্যাপক এলাকা বন্যামুক্ত করে সেচ সুবিধা বিস্তার করা
- পোলট্রি ক্ষেত্রে সুবিধা বাড়ানো
- উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা প্রতিরোধ, জলাবদ্ধতা দূর, জমি পুনরুদ্ধার ও দরিদ্রদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা
- প্রধান প্রধান খাদ্য ও সারের ওপর শুল্কহার (০) শূন্য রাখা
- কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন প্রয়াস
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রচেষ্টা
- গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ফসল ফলানোর প্রয়াস
- আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো কৃষিকে উন্নয়নের শিখরে নেওয়ার জন্য নিবেদিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার জন্য ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অর্জন করেছেন 'সেরেস পদক'। 'মাদার অব হিউমিনিটি' সম্মানেও ভূষিত হন তিনি। তাঁর সুচিন্তিত পদক্ষেপেই বাংলাদেশ কৃষি, মৎস্য, প্রাণী, সবজি, পুষ্টি– সব ক্ষেত্রেই সুনামের পথযাত্রী।

বঙ্গবন্ধুর কৃষিবান্ধব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে বিশ্বে মাথা উঁচু করে টিকে থাকার জন্যই কাজ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কৃষকগণের ভাগ্য উন্নয়নের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সে স্বপ্ন তাঁরই যোগ্য কন্যা, দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মপ্রয়াসেই রূপায়িত হবে– বর্তমানে এটাই বাস্তবতা। এদেশের মানুষের প্রত্যাশা– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই এ দেশটা হবে কৃষিবান্ধব বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বাংলা, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

স্বাধীনতা পুরস্কার পেল বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২ পদক বিজয়ীদের মাঝে তুলে দেন। শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করায় বিদ্যুৎ বিভাগকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' প্রদান করেছে সরকার। ১৫ই মার্চ ১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২ দেওয়ার ঘোষণা দেয় সরকার। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

পরে ১৮ই মার্চ পুরস্কারপ্রাপ্তদের সংশোধিত তালিকা প্রকাশ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সংশোধিত তালিকা অনুযায়ী স্বাধীনতা পুরস্কার পাওয়া অন্যরা হলেন– স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী, শহিদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম), আবদুল জলিল, সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, মরহুম মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন বিশ্বাস ও মরহুম সিরাজুল হক। চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক কনক কান্তি বড়ুয়া ও অধ্যাপক মো. কামরুল ইসলাম, স্থাপত্যে মরহুম স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডব্লিউএমআরআই)-এ পুরস্কার পাচ্ছে। এবার এ তালিকায় যোগ হলো বিদ্যুৎ বিভাগের নাম। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতা পদক দেওয়া হয়। স্বাধীনতা পুরস্কার দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক পুরস্কার। সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। স্বাধীনতা পুরস্কারের ক্ষেত্রে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ৫ লাখ টাকা, ১৮ ক্যারেট মানের ৫০ গ্রামের স্বর্ণপদক, পদকের একটি রেপ্লিকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: নওশান আহমেদ

বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বিশ্ব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে যেসব বিশ্বখ্যাত মহামনীষীর মেধা, মনন, প্রজ্ঞা, কর্মস্পৃহা ও দিক নির্দেশনা অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে তাঁদের অন্যতম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত জননেতা, নন্দিত বিশ্বনেতা এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলাদেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ছোট্টবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিক্ষা সচেতন মানুষ। তখন থেকেই তিনি শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। স্কুলজীবন থেকেই তিনি নিজের পড়ালেখার পাশাপাশি শিক্ষা সহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন। গরিব সহপাঠীদের নিজের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাসামগ্রী, এমনকি নিজের গায়ের জামাকাপড় পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেও কার্পণ্য করতেন না। তাঁর গৃহশিক্ষক শিক্ষাবঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তখনকার সময় মুসলমানদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল তুলে সেই অর্থ দিয়ে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করতে হতো। ছোট্ট বালক শেখ মুজিব দলবল নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে সে কাজে তাঁর শিক্ষককে সহায়তা করে কৈশোরকালেই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের (মথুরানাথ ইনস্টিটিউট) মিশন স্কুলে পড়ার সময় স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সেসময় স্কুলের মেরামত কাজ ও ছাদ সংস্কার, খেলার মাঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দীর কাছে স্কুলের স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা হিসেবে জরুরিভাবে অর্থ বরাদ্দ করার দাবি করে স্কুলের সমস্যা সমাধানে সফলও হন কিশোর শেখ মুজিবুর রহমান। সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই শিক্ষা ও হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য যে অপরিসীম দরদ সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে যা তাঁকে পরবর্তীতে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

বাঙালি জাতির সার্বিক উন্নয়ন তথা একটি উন্নত জাতি হিসেবে বাঙালিদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন লড়াই-সংগ্রাম করে গেছেন। শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া কোনো জাতিরই যে উন্নয়ন সম্ভব না তা তিনি প্রবলভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। তাই তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল বাঙালি জাতি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, যেখানে থাকবে না শ্রেণি বৈষম্য, উঁচুনীচু, ধনী-গরিবের বিভেদ-বিভাজন। আর এলক্ষ্যে শোষণমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণধর্মী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি আধুনিক মানসম্মত সুষম শিক্ষাব্যবস্থা।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন সুশিক্ষা ছাড়া দেশের উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। তাই তো তিনি যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে দেশে গণমুখী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সব ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখেই দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী শুধু আমাদের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ জনগণকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তথা শিক্ষা অবকাঠামোগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করা; সেই ধ্বংসযজ্ঞ তারা একাত্তরের দীর্ঘ নয় মাস ধরেই চালিয়েছিল।

বিচক্ষণ বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ-পরবর্তী অতি অল্প সময়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে গতি ফিরিয়ে আনার জন্য সেসময় সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ২০শে জানুয়ারি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী বঙ্গবন্ধুর সম্মতিক্রমে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনে ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দেন, যা সদ্য স্বাধীন দেশের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে বিরাট নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। সেসময় তাঁর সরকার বৃহৎ একটি কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করেছিল দেশের ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো পুনরুদ্ধার ও সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে।

বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন জাতিকে সুগঠিত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সুশিক্ষা। এমনকি শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যেন ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে কোনো ধরনের ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয়। মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের বিকাশ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্মাণে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন মূল শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণের পাশাপাশি তিনি বয়স্কদের জন্য চালু করেছিলেন নৈশ বিদ্যালয়।

শিক্ষার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল বঙ্গবন্ধুর। ব্রিটিশদের পশ্চিমা শিক্ষাতত্ত্ব, পাকিস্তানিদের শিক্ষা কমিশন ষড়যন্ত্র আর প্রচলিত অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার বিপরীতে বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন বাঙালির মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর এক বিজ্ঞানমনস্ক ও আদর্শিক শিক্ষাদর্শন। বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে জনমুখী ও সম্প্রসারণ করতে কোনো কৃপণতা করেননি। সেই লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন। দেশের সকল শিক্ষার্থী যেন দেশের প্রতিটি প্রান্তে বসে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাঁর স্বল্পকালীন সময়ের শাসনামলে প্রত্যন্ত

গ্রামগুলোতেও তৈরি করা হয় নতুন নতুন স্কুল ও কলেজ। শিক্ষকদের উদ্দেশে এক ভাষণে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আগামী প্রজন্মের ভাগ্য শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করছে। শিশুদের যথাযথ শিক্ষার ব্যত্যয় ঘটলে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা অর্থহীন হবে।'

১৯৭০ সালের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ দিনগুলোতেও বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা-বিবৃতিতে শিক্ষার গুরুত্ব সরাসরি উল্লেখ করেন। তিনি সব সময়ই সোনার বাংলা বিনির্মাণে সোনার মানুষ গড়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে। সেই ভাষণে তিনি সুস্পষ্ট কিছু প্রস্তাব রেখেছিলেন। যেমন: তিনি বলেন, সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। পাঁচ বছর বয়সি সকল শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। আর দারিদ্র্যতা যেন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেধাবীদের জন্য বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর শাসনামলে শিক্ষা সম্পর্কিত যে আইন প্রণয়ন করেছিলেন এবং বাস্তবায়নে চলমান ছিলেন সেগুলো হলো– প্রাইমারি এডুকেশন অ্যাক্ট ১৯৭৪, ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশন অব বাংলাদেশ অ্যাক্ট ১৯৭৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩ ও বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ান অ্যাক্ট ১৯৭৩ ও মাদ্রাসা এডুকেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭২।

বঙ্গবন্ধু দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা বিস্তার ও নিরক্ষর মুক্ত দেশ গড়ার প্রথম পদক্ষেপ ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন প্রণয়নের পর প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে শিক্ষাকে সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১৫ই জানুয়ারি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেই বঙ্গবন্ধু ঐ বছরের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বকেয়া বেতন মওকুফ করেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান করে শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ, ১১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ৪৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ ও চাকরি সরকারিকরণ, ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই, খাতা, পেনসিলসহ বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ ও গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পোশাক প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি বিদেশি বিস্কুট, ছাতু, গুঁড়োদুধসহ নানা খাদ্যসামগ্রীও শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত, ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলো মেরামত এবং অনেক নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শুধু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার প্রতিই জোর দেননি, দিয়েছিলেন মাধ্যমিকের ওপরও। পাকিস্তান আমলে তো বটেই, বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতাও হচ্ছে, প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তরণের সময় শিক্ষার্থীদের একটি বড়ো অংশ লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়ে। বর্তমানে এই হার অনেকটা কমে এলেও পাকিস্তান আমলে এটি ভয়াবহ মাত্রায় ছিল। তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভাষণের সময় এটির ওপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি প্রাথমিকের পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার যেন খোলা থাকে তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে, যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা, তিনি তখন এ ধরনের বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থী যাতে বিনা বাধায় লেখাপড়া করতে পারে তার ওপর জোর দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু যে কতটা শিক্ষানুরাগী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর সরকার স্বাধীন দেশে প্রথম ১৯৭২ সালের ৩০শে জুন যে বাজেট ঘোষণা করেছিল তার দ্বারা। ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে ঘোষিত ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে ৭% বরাদ্দ বেশি তথা প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ৪০ কোটি টাকা, আর শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৪৩ কোটি টাকা রেখেছিলেন। কারণ বঙ্গবন্ধু জানতেন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়া যাবে না, শুধু শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমেই দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করে জাতিকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া লাখ লাখ স্কুল-কলেজকে স্বাধীনতার পর খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই পুনর্গঠিত করেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫-এর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি যেভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিয়ে দেশকে একটি সম্মানজনক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার শুভ সূচনা করেছিলেন ইতিহাসে তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

বঙ্গবন্ধু কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদাকে সভাপতি করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সেই শিক্ষা কমিশন বেশ কয়েকটি মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করে; যার ভিত্তিতে দেশের শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। এই কমিশন ১৯৭৩ সালের জুন মাসে অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন এবং ১৯৭৪ সালের মে মাসে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন' শিরোনামে ৩০৯ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার বিষয়ে সর্বাধিক বিস্তৃত কাজ, যেখানে শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও দর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কমিশনের প্রধান পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্যে যেসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলো হলো: শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকর্ষিত করা, শিক্ষকদের জন্য সম্মানজনক পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা, শিক্ষার সব পর্যায়ে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ, ইংরেজি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া, শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়নের জন্য ফলিত গবেষণার ওপর জোর দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা, সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষাকে একটি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা।

এই কমিশন আরও সুপারিশ করেছে যে, প্রতিবছর জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে এবং ক্রমান্বয়ে তা ৭ শতাংশে বৃদ্ধির প্রস্তাবও দেওয়া হয় এই প্রতিবেদনে। বঙ্গবন্ধু এই প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট দুষ্কৃতিকারীদের নির্মম বুলেটে তিনি নিহত হওয়ায় তা আর বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি।

বঙ্গবন্ধুই ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আইন প্রণয়ন করেছিলেন। আইনটির মোট ১৫টি ধারা ছিল। ২০১০ সালে যে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়, তা ১৯৭২ সালের শিক্ষা কমিশনের আলোকে গঠন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালের শুরুতে তৎকালীন আইনমন্ত্রী

ড. কামাল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য গণতান্ত্রিক আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষকদের মতামত চান। সবাই নিজ নিজ মতামত পেশ করেন। এসব মতামতের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রশাসনিকভাবে স্বায়ত্তশাসন, সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাইকে গণতান্ত্রিক মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ প্রদান, শিক্ষার্থীদের একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়টিও সেই প্রস্তাবসমূহে উঠে আসে।

এসব প্রস্তাব পাওয়ার পর ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য দ্রুত আইন জারি করা হয়। আইনগুলো ছিল যথেষ্ট গণতান্ত্রিক ও অংশীদারিত্বমূলক। শিক্ষক-ছাত্রদের দীর্ঘদিনের চাওয়া-পাওয়ার প্রতিফলন ঘটে এই আইনগুলোতে। সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার ফলে একটা আমূল পরিবর্তন আসে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর সত্যিকার অর্থে তা জ্ঞান চর্চার তীর্থভূমি এবং মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর দেশ পরিচালনার জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তাতে তিনি শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে শিক্ষার বিষয়টি উল্লেখ আছে এভাবে– ১৭(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি ইসলামি ভাবাদর্শে বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে হাত দিলেন, অন্যদিকে শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে প্রথিতযশা উলামায়ে কিরামদের সম্পৃক্ত করার জন্য ও ইসলামি শিক্ষার অমোঘ মর্মবাণী সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ১৯৭৫ সালের ২২শে মার্চ বায়তুল মোকাররম সোসাইটি এবং ইসলামিক একাডেমি একীভূত করে এক অধ্যাদেশ বলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের ২৮শে মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়, যার সুষ্ঠু ও সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড আজ সারা বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামিক প্রকাশনা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রভূত সুনাম কুড়াচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ইসলামি শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তাসহ যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করেন। ইসলামি আকিদাভিত্তিক জীবন গঠন ও ইসলামি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন করেন। পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল না। বঙ্গবন্ধুই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এ প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিও বিশেষ আগ্রহ ছিল বঙ্গবন্ধুর। তিনি একটি বৈষম্য ও শোষণহীন উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল উৎপাদনমুখী দেশপ্রেমিক জনসমষ্টি সৃষ্টিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে দুটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (বর্তমান ঢাকা পলিটেকনিক) প্রতিষ্ঠা করেন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদপত্র প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় তদানীন্তন বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের উদ্যোগে 'ইস্ট পাকিস্তান বোর্ড অব এক্সামিনেশন ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন' নামে একটি বোর্ড স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব পালন, পরীক্ষা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গকে সার্টিফিকেট (ডিপ্লোমা) প্রদান। যা পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সালের ৭ই মার্চ সংসদীয় আইন বলে 'ইস্ট পাকিস্তান টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যার বর্তমান নাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতা-উত্তর বঙ্গবন্ধু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন আমাদের উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণের পথকে সুগম করেছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো নির্দেশনাতেই একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর, dr.alim1978@gmail.com

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় ১৩৮ অনুসমর্থন করল বাংলাদেশ

কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থন করল বাংলাদেশ। এ কনভেনশন অনুসমর্থনের মাধ্যমে সবকটি মৌলিক কনভেনশন অনুসমর্থনের মাইলফলক স্পর্শ করল বাংলাদেশ। ২২শে মার্চ জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর সদর দপ্তরে বাংলাদেশের পক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান স্বাক্ষরকৃত অনুসমর্থনপত্র আইএলও-এর মহাপরিচালক গাই রাইডারের হাতে তুলে দেন।

অনুসমর্থন পত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে জবরদস্তিমূলক শ্রম সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৩০-এর প্রটোকল-২০১৪ অনুসমর্থন করেছে এবং ২২শে মার্চ কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থনের মাধ্যমে সকল মৌলিক কনভেনশন এবং এ সংক্রান্ত প্রটোকল অনুসমর্থন করল। সরকার আইএলও শ্রমমান বজায় রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে তিনি বলেন, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইএলও-র ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ ২৯টি দলিলে অনুসমর্থন করেন। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে বঙ্গবন্ধুর মতোই কর্মস্পৃহা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রতিবেদন: রবিউল হাসান

বঙ্গবন্ধু

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বন্ধু

অনুপম হায়াৎ

জাতির পিতা, মহান নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) বাংলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিরও বন্ধু। তাঁর জীবন ও কর্মে, চিন্তাভাবনায়, লেখায়, রচনায়, মননে, পৃষ্ঠপোষকতায়, স্মৃতিতে, প্রীতিতে, ভাষণে, বিবৃতিতে, বাণীতে ঋদ্ধ হয়েছে এদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। অন্যদিকে তাঁর ব্যক্তি জীবন, কর্ম, আদর্শ, স্বপ্ন নিয়েও দেশ-বিদেশে রচিত হয়েছে শত শত বই, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নাটক, গান, ভাস্কর্য ও চলচ্চিত্র।

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার সংস্কৃতি।' তিনি আরও বলেন, 'ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ছাড়া কোনো জাতিই উন্নতি করতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে, জনগণই সব সাহিত্য ও শিল্পের উৎস'।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা-সৃজন ও মনন সম্পর্কে জানা যায় তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থ, ভাষণ, অন্যের লেখা রচনা, স্মৃতিকথা ও সমকালীন সংবাদপত্র থেকে। ১৯৭১ সালের মার্কিন *সাপ্তাহিক নিউজউইক* বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করেছিল 'রাজনীতির কবি' হিসেবে। আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন 'রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী' হিসেবে। পাকিস্তান আমলে দেশের শিল্পীসমাজ বঙ্গবন্ধুকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' হিসেবে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন এবং জানতেন যে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই তিনি রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে পরিপূরক হিসেবে দেখেছেন। হাজার বছরের বাংলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে মন্থন করেই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন রাজনীতির কবি এবং বিশ্ববন্ধুও। তাঁর বিচ্ছুরিত প্রভায় আলোকিত-সঞ্জীবিত-স্পন্দিত-গৌরবদীপ্ত হয়েছে এদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো।

পণ্ডিতদের মতে, শিল্প হচ্ছে– আত্মার সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতি হচ্ছে– জনগোষ্ঠীর যাপিত জীবনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আচরণ, রীতি, পেশা, ধর্ম, দর্শন, ভাবনা, বস্তুগত অর্জন, বুদ্ধিজীবীগত বিকাশ, বিনোদন প্রভৃতি। বঙ্গবন্ধুর মধ্যে হাজার বছরের বাঙালির এসব বৈশিষ্ট্য নান্দনিকভাবে প্রকাশ ঘটেছিল।

শৈশব-কৈশোরে জন্মস্থানের ভূ-প্রকৃতি, জনজীবন, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা ও ক্রীড়া সাহচর্য তাঁকে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক মানস কাঠামোর উপাদান। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে রয়েছে তার উল্লেখ। তিনি লিখেছেন যে, শৈশব-কৈশোরে তিনি গান গাইতেন, খেলাধুলা করতেন, ব্রতচারী করতেন। বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক মানস কাঠামো গঠনে বই এবং পত্রপত্রিকা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সেই ১৯৩০ দশকে তাঁর পরিবারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আজাদ*, *সওগাত*, *মোহাম্মদী*, *আনন্দবাজার*, *বসুমতী* পত্রিকা রাখা হতো। তিনি এগুলো পড়তেন। *কারাগারের রোজনামচায়* তিনি লিখেছেন, 'বই আর কাগজই আমার বন্ধু'।

আমরা জানি বঙ্গবন্ধু সেই ১৯৪০ দশক থেকে ১৯৬০ দশক পর্যন্ত বিভিন্ন সংবাদপত্রেরও সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এসবের মধ্যে ছিল– *মিল্লাত*, *ইত্তেফাক*, *নতুন দিগন্ত*, *বাংলার বাণী*। তিনি এসব পত্রিকায় স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখতেনও। আর বই এবং সংবাদপত্র হচ্ছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন রাজনৈতিক, সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম লেখক। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থ *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১৩), *আমার দেখা নয়াচীন* (২০১৭) ও *কারাগারের রোজনামচা* (২০২০) ইতিহাসের স্বর্ণখণ্ড হিসেবে বিবেচিত। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির আরেকটি বড়ো আধার হচ্ছে লাইব্রেরি। তিনি বাড়িতে লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয়েও তিনি গড়ে তুলেছিলেন লাইব্রেরি। পাঠ বা অধ্যয়নকে তিনি রাজনীতির বোধ ও চর্চার অংশ ভাবতেন। আর বই হচ্ছে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিভিত্তিক সমাজ গঠনের হাতিয়ার।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব দান ও অংশগ্রহণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সোনালি অধ্যায়। এর ফলে জাতীয় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠন এবং পরবর্তীকালে বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভাষাশহিদ দিবসে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি তর্পণ, ভাষণ, বাণী, মিছিলে অংশগ্রহণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যপ্রীতি, কবিতাপ্রীতি, সংগীতপ্রীতি কিংবদন্তি হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকদের কবিতা ও গান ছিল বঙ্গবন্ধুর আশ্রয়। জেল জীবনে, মুক্ত জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে তিনি তাঁদের রচিত গান ও কবিতা আবৃত্তি করতেন ও গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা'কে তিনি জাতীয় সংগীত এবং নজরুলের 'চল চল চল'কে রণ সংগীত হিসেবে সাংবিধানিক মর্যাদা দিয়েছেন। ১৯৪১ সালে বঙ্গবন্ধু কবি নজরুল ও অন্যান্যকে ফরিদপুরে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে নজরুলকে তিনি বাংলাদেশে

এনে নাগরিকত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধ থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগানটি গ্রহণ করেছেন। তাঁকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য, বাণী ও শ্রদ্ধা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মূল্যবান উপাদান হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর সংগীতপ্রিয়তা সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বাংলাদেশের লোকগান, জারি-সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা পছন্দ করতেন। শিল্পী আব্বাসউদ্দিন, রমেশ শীল, সনজীদা খাতুন, শেখ রোকন উদ্দিন, শাহ আবদুল করিমের গান তিনি পছন্দ করতেন। সত্যজিৎ রায়ের গোপী গাইন বাঘা বাইন ছবির মোরা বাংলাদেশের থেকে এলাম, শৈলজানন্দের ছায়াছবি মানে না মানা'র 'হবে হবে জয়', পান্নালাল ভট্টাচার্যের গাওয়া 'আমার সাধ না মিটিল' প্রভৃতি গান বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন।

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিকদের সান্নিধ্য বঙ্গবন্ধু খুব পছন্দ করতেন। জসীমউদদীন, জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, শাহাবুদ্দিন, নীলিমা ইব্রাহীম, মাজহারুল ইসলাম, মানিক মিয়া, এবিএম মুসা, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী প্রমুখ তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন। চলচ্চিত্রের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (১৯৫৭)। তাঁর আমলে (১৯৭১-১৯৭৫) বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ ও সাহিত্যভিত্তিক অনেক কালজয়ী চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। তিনি চাষী নজরুল ইসলামের *সংগ্রাম* এবং জাপানি পরিচালক নাগিসা ওশিমার *রহমান: ফাদার অব বেঙ্গল* প্রামাণ্যচিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া তিনি *রূপবান* এবং *নবাব সিরাজদ্দৌলা* চলচ্চিত্রও দেখেছিলেন।

নাটক ও যাত্রাশিল্পের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় অবদান রয়েছে। তিনি ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করেন। এর ফলে বাংলাদেশে নাটক রচনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্র সুগম হয়। তাঁর অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতা-উত্তর পরিবেশে বাংলাদেশ নাট্য আন্দোলন বিকশিত হয়। নাটকে বাংলাদেশের ইতিহাস, জীবন, সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধ নতুন মাত্রায় পরিবেশিত হয় মঞ্চ, বেতার ও টিভিতে।

বঙ্গবন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতা, সক্রিয় উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এর মধ্যে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, সিনেমা হল নির্মাণ, স্টুডিও সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন।

তিনি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলা একাডেমিকে পুনর্গঠন করেছিলেন। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা, উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। তিনি নিজেও এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৯৭৪) উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে– 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি' (১৯৭৪), সোনারগাঁওস্থ 'বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন' (১৯৭৫), নেত্রকোনাস্থ 'উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি', রাঙ্গামাটিস্থ 'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট', 'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র' প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর আমলে চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিনিধি প্রেরণ, শিক্ষার্থী প্রেরণের সুযোগ হয়। ভারত, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভিয়া প্রভৃতি দেশে বহু বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চতর বিষয়ে লেখাপড়ার জন্য যায় এবং তারা ফিরে এসে বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতির উন্নয়নে অবদান রাখে।

বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুপদী অবদান হচ্ছে– তাঁর জীবন-কর্ম-আদর্শ ও স্বপ্ন নিয়ে রচিত অজস্র কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ভাস্কর্য ও চলচ্চিত্র। ইতোমধ্যেই তাঁকে নিয়ে দেশ-বিদেশে রচিত হয়েছে শত শত গ্রন্থ ও ফটো অ্যালবাম। এভাবেই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছেন বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির অম্লান নক্ষত্র; যাঁর বিচ্ছুরিত আলো জাতিকে দেখাবে এগিয়ে চলার পথ।

অনুপম হায়াৎ : লেখক, গবেষক ও শিক্ষক

প্রবাসী কর্মীদের সেবায় বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসী কর্মীদের সেবায় ঢাকায় 'বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার' উদ্‌বোধন করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

মন্ত্রী ১৮ই মার্চ বিদেশগামী এবং বিদেশ থেকে ফেরত আসা কর্মীদের জন্য ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছেই বরুয়া লঞ্জনী পাড়ায় স্থাপিত 'বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার' উদ্‌বোধন করেন। এই সেন্টার তৈরি করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড। ১৪০ কাঠার বেশি জায়গায় নির্মিত সাময়িক এ আবাসস্থলে প্রবাসীরা রাতযাপন করতে পারবেন। এ সেন্টারে নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সেন্টারটিতে আপাতত ৪৯ জনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক রাত থাকার জন্য প্রবাসী কর্মীদের খরচ হবে মাত্র ২০০ টাকা। রয়েছে সাশ্রয়ী মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা। এখানে প্রবাসী কর্মীদের রিইন্টিগ্রেশন (পুনঃএকত্রীকরণ) এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বা করণীয় সম্পর্কে ব্রিফিং দেওয়া হবে। কর্মীদের জন্য সেন্টার থেকে বিমানবন্দরে যাতায়াতের জন্য পরিবহণ সুবিধাসহ সেফ লকারে লাগেজসহ মূল্যবান মালামাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা, টেলিফোন সুবিধা, ইন্টারনেট ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ রয়েছে। এছাড়া কর্মীদের জন্য কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনের ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থাও থাকছে। সেন্টারের আওতায় সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে বিদেশগামী ও ফেরত প্রবাসী কর্মীরা ১০০ টাকা ফি দিয়ে সরাসরি কিংবা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সেন্টার অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন– পাসপোর্ট ও এয়ার টিকিট কপি, বহির্গমন ছাড়পত্র/মেম্বারশিপ সনদের কপিসহ সংশ্লিষ্ট কাগজ লাগবে। একজন কর্মী একটি সিটের জন্য আবেদন করতে পারবেন। একজন প্রবাসী প্রতিবার সর্বোচ্চ দুই রাত অবস্থান করতে পারবেন এ সেন্টারে।

প্রতিবেদন: শুভ দেব

শপথ গ্রহণের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন তাজউদ্দীন আহমদ

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা

ড. সুলতানা আক্তার

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল একটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে এবং ঐ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির উদ্দেশে দেওয়া দিক নির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক রাষ্ট্র এবং জনগণের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ভারত ও তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যতীত অন্য দেশগুলো সরাসরি বাংলাদেশকে সহযোগিতা না করলেও অপরাপর বৃহৎ শক্তিগুলোর জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেয়। আন্তর্জাতিকভাবে এ অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যক্রমই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ হলেও পররাষ্ট্র বিষয়ক অনেক কার্যক্রমের তদারকি করতেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ। তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগর সরকার গঠনের পর থেকেই এ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে অগ্রসর হন। তিনি প্রথমেই চেষ্টা করেন যাতে এই সরকারকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ স্বীকৃতি দান করে। তাজউদ্দীন আহমদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি সাহায্য ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়। নৈতিক ও বস্তুগত উভয় দিকেই তিনি বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন।[১] ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের পর প্রদত্ত ভাষণে তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করার জন্য ভারতকে ধন্যবাদ দেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, গণচীন ও ব্রিটেনের সাহায্য কামনা করেন। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য তিনি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানান।[২] এ ভাষণে তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে বলেন, 'Pakistan is now dead and buried under a mountain of corpses...We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood.'[৩]

এছাড়া তিনি বৃহত্তর ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন, কোনো ব্লক বা প্যাক্টে আমরা যোগদানে উৎসাহী না, কিন্তু যারা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে শুভেচ্ছা ও সাহায্য করতে আগ্রহী তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা চাই। আমরা বিশ্বের দেশসমূহের নিকট স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি, বস্তুগত ও নৈতিক সাহায্য চাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। প্রতিটি মুহূর্তের বিলম্বে হাজার হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। মানবিক কার্যক্রমে যারা এগিয়ে আসবে তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব অমলিন থাকবে।[৪] এছাড়া ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণের আগেই তাজউদ্দীন আহমদ চেষ্টা করেন পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীকে বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশের জন্য। ১৫ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ গোপনে কলকাতায় নিযুক্ত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দুদফা বৈঠকে স্থির হয় যে, ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী এবং ঐ কমিশনে বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ১৮ই এপ্রিল একযোগে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করবেন।[৫] তাজউদ্দীন আহমদের প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী, পাঁচজন কর্মকর্তা ও ৬৫ জন কর্মচারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আনুগত্য প্রকাশ করার পরে হোসেন আলীর অফিস ৯নং সার্কাস এভিনিউ হয়ে যায় বাংলাদেশ মিশন। এই ভবনেই পাকিস্তানের পতাকা বাদ দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সারা ভারতে শুধু এই একটি ভবনেই বাংলাদেশের পতাকা উড়ত।[৬]

এরপর তাজউদ্দীন আহমদের পরামর্শে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম ১০৭টি চিঠি তৈরি করেন। এসব চিঠি বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বিভিন্ন দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। চিঠিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম দস্তখত করেন। এই চিঠিগুলোতে কাউন্টারসাইন করার জন্য একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্টারসাইন করবেন। কিন্তু খোন্দকার মোশতাক আহমদ তখনই সেই চিঠিতে স্বাক্ষর করেননি। এজন্য এই সমস্ত চিঠিপত্রের যোগাযোগ খোন্দকার মোশতাক আহমদের কারণে কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে যায়। তিনি একটি অজুহাত দাঁড় করেন যে, তার পরিবার এখনো আসছে না, সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত। এর কিছুদিন পর তার পরিবার পরিজন কলকাতায় পৌঁছলে চিঠিতে দস্তখত করেন।[৭] মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ ভারতের স্বীকৃতির আশা পোষণ করেছিল। তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৭১ সালের ৩রা এপ্রিল প্রথম সাক্ষাতেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে তড়িঘড়ি না করে বরং একটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[৮] বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবনগর সরকারকে বিশেষ করে তাজউদ্দীন আহমদকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ করতে হয়। কারণ পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতেন। সেক্ষেত্রে তাজউদ্দীন আহমদকে সার্বিক দিক পরিচালনা করতে হতো। যেমন:[৯]

ক. সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ; খ. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন; গ. এ লক্ষ্যে পাকিস্তানে কর্মরত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে বিদেশি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কূটনৈতিকবৃন্দকে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা ও কর্মে যোগদান; ঘ. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দূতাবাস খুলে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার, জনমত ও স্বীকৃতি আদায়ে তৎপর হওয়া; ঙ. বহির্বিশ্বে প্রচার-প্রচারণা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি; চ. বাংলাদেশবিরোধী প্রচারের সমুচিত জবাবদান; ছ. বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী যে-কোনো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা; জ. সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি এবং ঝ. মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা।

একইসঙ্গে মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত করা হয়। যেমন :[১০]

ক. সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়; খ. রাজনৈতিক অবদমন, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অবসানে অঙ্গীকার; গ. জোটনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এ তিনটি বিষয় হবে বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি; ঘ. পৃথিবীত্রাসী ও আঞ্চলিক শান্তি বিনষ্টকারী সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধিতা; ঙ. সেন্টো এবং সিয়াটো চুক্তিসহ ন্যায়সংগত আন্দোলন দমন করার সহায়ক সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ; চ. সাম্রাজ্যবাদ ও নব্য সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং ছোটো দেশগুলোর উপর বহিঃশক্তির সর্বপ্রকার অশুভ প্রভাব নিরোধ প্রচেষ্টা এবং ছ. পাস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সংলাপ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ বা জাতির মধ্যে বিরাজমান জটিলতার সমাধান।

একইসঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে সকল পরাশক্তির সমর্থন প্রত্যাশা, এশিয়ার পুনঃজোটবদ্ধতার বিরোধিতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ, ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবেদন ও অব্যাহত কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার।[১১]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ মন্ত্রিসভার সদস্য বিভিন্ন প্রয়োজনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গেই ভারত সরকারের উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগ রক্ষিত হতো। তিনি তাঁর একান্ত সচিব হিসেবে মঈদুল হাসানকে দিল্লি পাঠাতেন ভারত সরকারের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। এসব আলোচনা বেশ ফলপ্রসূ হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব পি এন হাকসার ও উপদেষ্টা অধ্যাপক পি এন ধরের সঙ্গে মঈদুল হাসানের সখ্যতা গড়ে ওঠে। উভয় পক্ষের এসব আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা চলে।[১২]

পাকিস্তানের সরকার যেন দাতাদের সাহায্য না পায়, এজন্য মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ রেহমান সোবহানকে লন্ডন ও যুক্তরাষ্ট্র যেতে অনুরোধ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে রেহমান সোবহান এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে যান। তিনি সেখানে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর ব্রিটিশ বন্ধুদের সহায়তায় পাকিস্তানি নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া সাংবাদিক ব্রায়ান ল্যাপিংয়ের মাধ্যমে লেবার পার্টির কয়েকজন এমপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ সরকার যেন পাকিস্তানকে সহায়তা প্রদান না করে তিনি সেজন্য তাদেরকে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানান।[১৩] মুক্তিযুদ্ধকালীন ইয়াহিয়ার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম. এম. আহমদ আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান।[১৪] এ ধরনের তৎপরতা বন্ধ করার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালানোর জন্য তাজউদ্দীন আহমদ রেহমান সোবহানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান। রেহমান সোবহান 'মোহন লাল' ছদ্মনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য প্রচারণা চালান।[১৫] রেহমান সোবহানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক তৎপরতার মধ্যে ছিল পাকিস্তান সরকারকে যাতে সামরিক বা অর্থনৈতিক সহায়তা না করে এবং বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দান করে। তাঁর তৎপরতার কারণেই এম. এম. আহমদ ওয়াশিংটনে তেমন সুবিধা করতে পারেনি।[১৬] তাজউদ্দীন আহমদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এ. আর. মল্লিককে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কূটনৈতিক সফরে প্রেরণ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রায় ৩০টি গণসংযোগ করেন।[১৭]

১৯৭১ সালের ১লা জুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক নীতি নির্ধারণী বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের কাঠামোতে কোনো রকম আপোশ-মীমাংসার প্রশ্নই উঠতে পারে না।' বহির্বিশ্বে বিভিন্ন মহলে বাংলাদেশ সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধান' সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা উঠেছে তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাজউদ্দীন আহমদ উপর্যুক্ত ঘোষণা দেন। এই বিবৃতির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পাকিস্তান কাঠামোর আওতায় যে রাজনৈতিক সমাধান হবে না তার দ্ব্যর্থহীন প্রতি উত্তর দেওয়া হয়। পররাষ্ট্রনীতি ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন,

‘আমাদের বৈদেশিক নীতি হবে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।’ তিনি বৃহৎ শক্তির নিশ্চুপ থাকার বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বর্তমান আমাদের সংকটময় সময়ে প্রতিবেশী বা যে-কোনো রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করুক না কেন, আমাদের বিদেশ নীতির মূল কথা হলো, ‘সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।’ এই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করে যাচ্ছে।”[১৮] **১৯৭১** সালের **২৯শে** জুন মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আবদুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল নেপাল যায়। প্রতিনিধিদল সেখানে নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী থাপা ও প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঋষিকেশ সাহার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে নেপালের সরকার ও জনগণের সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের অনুরোধে নেপালের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদগণ ‘বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি’ গঠন করে। এ সময় ঋষিকেশ সাহার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের উপর মুজিবনগর সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত কাগজপত্র, ছবি ও বিভিন্ন প্রচারপত্র নেপালের রাজ দরবারে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়।[১৯] মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় আগস্ট মাসে ইরাকের পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ এবং সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবুল মোমেন বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে যোগ দেন। ২৭শে আগস্ট লন্ডনের বেজওয়াটার এলাকায় ২৪নং পেমব্রিজ গার্ডেনে অনেক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন করা হয়। ভারতের বাইরে লন্ডনেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। এরপর **১১**নং গ্রোয়িং স্ট্রিট থেকে সরকারি কর্মচারীরা পেমব্রিজ গার্ডেনে এসে অফিস করতে শুরু করেন ও কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন।[২০]

Justice Abu Sayeed Chowdhury is seen at a public meeting in London, appealing to the world to support the Bangladesh war of liberation and demanding release of Bangabandhu from Pakistani jail

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এবং মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতে বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি **১৯৭১** সালের **১৫ই** অক্টোবর, ১৫ই নভেম্বর ও ২৩শে নভেম্বর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ প্রসঙ্গে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনটি চিঠি লেখেন।[২১] এদিকে খোন্দকার মোশতাক গোপনে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমেরিকার গোপন দলিলপত্রে দেখা যায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদের নির্দেশে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ. এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী জহিরুল কাইউম জুলাই মাসের ৩০ তারিখে কলকাতাস্থ আমেরিকান কনস্যুলেট অফিসে সাক্ষাৎ করতে যান এবং মার্কিন কূটনীতিকদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সম্পর্ক গড়ে তোলেন।[২২] তাজউদ্দীন আহমদের অজ্ঞাতে এই সাক্ষাৎটি ঘটে। পরে তিনি এটি জানতে পেরে এ ধরনের প্রচেষ্টার ঘোর বিরোধিতা করেন।[২৩] মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক তাজউদ্দীন আহমদ পাকিস্তান কাঠামোতে সমস্যা সমাধানের সকল সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের কাঠামোতে কোনো রকম আপোশ-মীমাংসার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না’।[২৪]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের হস্তক্ষেপে মার্কিন প্রশাসনের সহায়তায় পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের লক্ষ্যে মোশতাকের জাতিসংঘে যোগদানের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। তাজউদ্দীন আহমদ **১৯৭১** সালের **২১শে** সেপ্টেম্বর খোন্দকার মোশতাকের পরিবর্তে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পাঠান।[২৫] উল্লেখ্য যে, তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ইয়াহিয়া সরকারকে যাতে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো অস্ত্র সাহায্য না দেয় তার জন্য তিনি বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার কূটনৈতিকভাবে নিজেদের ভাবমূর্তি যথাসম্ভব তুলে ধরতে সক্ষম হন এবং আনুষ্ঠানিক না হলেও তাদের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। মার্কিন সিনেটর কেনেডি যখন তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তার মাধ্যমে এই সরকারের গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক রায়ের বর্ণনা অনুযায়ী:

> কনেডি সাহেব একটা গেট দিয়ে রাজভবনে ঢুকলেন। এমন ব্যবস্থা করেছিলাম তাজউদ্দীন সাহেব, খোন্দকার মোশতাক আহমদ সাহেব এলেন এবং দেখা হলো। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যে জিনিসটা হলো কেনেডি ঘরে ঢোকার পর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, উনি হলেন তাজউদ্দীন আহমদ। মি. কেনেডি বললেন, ‘আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি টু মিট ইউ মি. প্রাইম মিনিস্টার।’ এটা নিছক কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও কংগ্রেসের ভেতরে আলোচনা হয়েছে। সে যাই হোক উনি কথা বললেন বেশ অন্তরঙ্গভাবে। সব কথা বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করা অশোক রায়ের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠেকেছিল।[২৬]

১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আরেকটি চিঠি দেন। ৬ই ডিসেম্বর লোকসভায় একটি বিবৃতি দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী জানান, বাংলাদেশকে ভারত আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। তিনি বলেন, 'উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ সরকারের বার বার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু বিবেচনা করে ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'[২৭] ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এটা মুজিবনগর সরকারের বিশেষ করে তাজউদ্দীন আহমদের বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক সাফল্য অসাধারণ। এই অর্জন, এর সঙ্গে জড়িত সকলের প্রাপ্য। যদিও এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তি নিয়োজিত ছিলেন তথাপি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় সরকারের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

তাজউদ্দীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো কূটনৈতিক সাফল্য হচ্ছে মোশতাক-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপথ পালটে যেত। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আরেকটি বড়ো সাফল্য হচ্ছে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে বাংলাদেশ বিজয়ের পথে এক ধাপ এগিয়ে যায়। এছাড়াও মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক প্রচারণার ফলে বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালি কূটনৈতিকগণ বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ করে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কূটনৈতিক তৎপরতার ফলেই বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশে যে গণহত্যা হচ্ছে তা জানতে পারে এবং গণহত্যা বন্ধের জন্য বিভিন্ন দেশের জনগণ সোচ্চার প্রতিবাদ করেন। তাছাড়া কূটনৈতিক তৎপরতার ফলেই শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে বিশ্ববাসী জানতে পারে এবং শরণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সাহায্য, খাদ্যদ্রব্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জাতিসংঘের প্রতিনিধি বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে শরণার্থীদের দুর্দশা দেখতে এসেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদের আহ্বানে। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বিপুল সাহায্য সামগ্রীসহ রেডক্রস দলের বাংলাদেশে আগমন মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র বিষয়ক এক বিরাট সাফল্য। আর এই সাফল্যের পেছনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ।

তথ্য নির্দেশ

১. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awamileague*, Dhaka, UPL, 1982, p.196.

২. তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ, ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১। সিমিন হোসেন (সম্পা.) *তাজউদ্দীন আহমদ ইতিহাসের পাতা থেকে*, ঢাকা, প্রতিভাস, ২০০০, পৃ. ১২০-১২১।

৩. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, পৃ. ৩১-৩২। এরপর থেকে শুধু দলিলপত্র লিখা হবে।

৪. *দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২।

৫. আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ*, বাংলা একাডেমি, জুন ২০১৪, পৃ. ৫৪।

৬. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৮৪-৮৫।

৭. ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামের রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার, ১০ই নভেম্বর ২০১৮। আমীর-উল-ইসলাম একজন খ্যাতিমান আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ। তিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুর সহযোগী আইনজীবী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে কজন নেতা মুজিবনগর সরকার সংগঠন করেছিলেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তিনি তাজউদ্দীন আহমদের সান্নিধ্যে থেকে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

৮. মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬, পৃ. ২০।

৯. আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১০. আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬।

১১. আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

১২. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা, অনার্য, ২০১৭, পৃ. ২৬১।

১৩. রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন ২০০৮, পৃ. ১০৫-১০৬।

১৪. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৭, পৃ. ১১৩।

১৫. অশোক মিত্র, *আপিলা চাপিলা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ১৯১।

১৬. আফসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

১৭. এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৭৮।

১৮. আবু সাঈদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১৯. এ. কে. এম. জসীম উদ্দীন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া: তুলনামূলক পর্যালোচনা', অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩, পৃ. ৯২।

২০. আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি*, ঢাকা, অনন্যা, ১৯৯১, পৃ. ১৩৫।

২১. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩।

২২. শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা, বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ২৪৩।

২৩. শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০।

২৪. *দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২।

২৫. শারমিন আহমদ, *তাজউদ্দীন আহমদ নেতা ও পিতা*, ঢাকা, ঐতিহ্য, ২০১৪, পৃ. ১১৫-১১৬।

২৬. আবু সাঈদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

২৭. Indira Gandhi, *India and Bangladesh: Selected Speeches and Statements March to December 1971*, New Delhi, Orient Longman, p.133.

ড. সুলতানা আক্তার: সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, sultana_hist34ju@yahoo.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু

মিলন সব্যসাচী

১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বাঙালি জাতির সব অর্জনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। একশো বছর আগে ১৯২১ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড-হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ১৯১২ সালের ২৭শে মে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট নাথান কমিশন গঠিত হয়। ১৯১৩ সালে নাথান কমিশন ইতিবাচক প্রতিবেদন পেশ করে। সে বছরের ডিসেম্বর মাসেই নাথান কমিশন কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ আরও সুগম হয়ে ওঠে। ১৯১৭ সালে স্যাডলার কমিশনের ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সোপান নির্মিত হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে ১৯২০ সালের ১৩ই মার্চ ভারতীয় আইনসভায় 'দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট ১৯২০' পাস হয়। ২৩শে মার্চ গভর্নর জেনারেল বিলে সম্মতি দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যাঁরা স্মরণীয়, বরণীয় এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে ছিলেন স্যার নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সেই সময় ১৯১৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল পরীক্ষার জন্য ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে একমাত্র বাঙালি মুসলমান সদস্য ছিলেন খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উপলক্ষে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে নানা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– শিক্ষার গুণগত মান ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প এবং মৌলিক গ্রন্থ রচনাসহ জার্নালসমূহ আধুনিকায়ন ও শতবর্ষের ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় *হিস্ট্রি অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি*, এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর সম্পাদনায় *দ্য রোল অব ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইন মেকিং অ্যান্ড সেপিং বাংলাদেশ* নামক দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংযোজনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারসমূহ আধুনিকায়ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, 'এই জাতির যা কিছু মহৎ, যা কিছু উত্তম তার সবকিছুর পেছনের যে ভূমিকা তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের সব ইতিহাস একসূত্রে গাঁথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই দেশের এই ভূখণ্ডের মানুষের উচ্চশিক্ষার পথটি সুগম করে। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ইতিহাসে স্বর্ণ উজ্জ্বল থাকবে। আর একইসঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে এই দেশের মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম সর্বক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।' ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে বেরিয়েছে ইমতিয়াজ আহমেদ ও ইফতেখার ইকবাল সম্পাদিত ইংরেজি সংকলনগ্রন্থ, ফেব্রুয়ারিতে বেরিয়েছে সৈয়দ আবুল মকসুদের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা* নামের গ্রন্থ। বছর শেষে বেরিয়েছে একই লেখকের এই গ্রন্থের সম্পূরক *স্যার ফিলিপ হার্টগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য* শীর্ষক গ্রন্থ।

১৯২১ সালের ১লা জুলাই কলা, বিজ্ঞান ও আইন এই তিনটি অনুষদ এবং ১২টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। এই বিভাগগুলো হচ্ছে– সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ, ফারসি ও উর্দু, দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত ও আইন। শুরুতে মাত্র ৬০ জন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭৭। এর মধ্যে ছাত্রী ছিলেন মাত্র একজন। ছাত্রদের জন্য ছিল সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল এই তিনটি আবাসিক হল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি অনুষদ, ৮৩টি বিভাগ, ১২টি ইনস্টিটিউট, ২০টি আবাসিক হল, ৩টি হোস্টেল এবং ৫৬টিরও বেশি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে প্রায় ৩৭০১৮ এবং ১৯৯২। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা এবং এই জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে গ্রন্থাগার, গবেষণা কর্ম, উচ্চতর গবেষণা, পাবলিক লেকচার, পিএইচডি, ডিলিট ও ডিএসসি, সম্মানজনক ডিগ্রি প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ইত্যাদি উপশিরোনামে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অনুষদসমূহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রার প্রথম দুই দশক উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন লাভ করেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক অবদান বাঙালি জাতির জন্য চিরকাল স্মরণযোগ্য। যুগে যুগে দেশ বরেণ্য সূর্যসন্তানদের স্মৃতিধন্য সূতিকাগার এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এদের মধ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সূর্যসন্তান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯২১ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মের মাত্র ১ বছর পর। তাঁর জন্ম হয়েছিল বলেই আমরা পেয়েছি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতি রাষ্ট্রের এই মহান স্বপ্নদ্রষ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির সমুজ্জ্বল ইতিহাসের অমলিন অধ্যায়ে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। মুসলিম হলের সঙ্গে তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক ছিল। মূলত তিনি ছিলেন স্যার সলিমুল্লাহ হলের ছাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্র নেতাদের ঐক্যবদ্ধ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠন করেন। ১৯৪৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন বেগবান করে তোলার কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কারামুক্ত হয়ে শেখ মুজিবুরসহ তুখোড় তরুণ ছাত্রনেতারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনকে আরও গতিশীল করে তোলেন। ১৯৪৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তখন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্যে বিভিন্ন দাবি নিয়ে অসন্তোষ বিরাজমান ছিল। ১৯৪৯ সালের ৩রা মার্চ থেকে কর্মচারীরা ধর্মঘট শুরু করে আন্দোলনের গতি তুঙ্গে তোলে। কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসমাজ ৩রা মার্চ ক্লাস বর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বানে ৫ই মার্চ পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘটের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেলা ১২টায় এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঘোষণা করা হয়– কর্মচারীদের দাবিদাওয়া কর্তৃপক্ষ যতদিন মেনে না নেবে, ততদিন সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রনেতা ও যুবকর্মী হিসেবে কর্মচারীদের আন্দোলনকে শুরু থেকেই সমর্থন করে আসছিলেন। প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার জন্য ১১ই মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৯ সালের ২৬শে মার্চ ২৭ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৬ জন ছাত্রছাত্রীকে ৪ বছরের জন্য বহিষ্কারের নির্দেশ প্রদান করা হয়। ১৫ জন ছাত্রছাত্রীকে আবাসিক হল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেখ মুজিবুর রহমানসহ শীর্ষস্থানীয় ৫ জনকে ১৫ টাকা করে জরিমানা করা হয় এবং তাঁদের মুচলেকা দিতে হুকুম করা হয়। অনাদায়ে ছাত্রত্ব বাতিল করার ঘোষণা করে। ১৯৪৯ সালের ২০শে এপ্রিল কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল ও অবস্থান ধর্মঘট ডাকা হয়। এসময়ে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তার অবস্থায় তাঁকে মুচলেকা ও জরিমানা দিতে বলা হয়। শেখ মুজিব মুচলেকা ও জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের সমাপ্তি হয়।

পরবর্তীতে মেধা, মনন, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রনেতা থেকে জাতীয় নেতা হয়ে ওঠেন। জাতীয় নেতা

কার্জন হল

হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মুজিবের দূরত্ব সৃষ্টি হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব যৌক্তিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর অতুলনীয় সংশ্লিষ্টতা ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন বাঙালিদের প্রাণপ্রিয় নেতা। শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি রমনার রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে আয়োজিত জনসভায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তৎকালীন তুখোড় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ সকলের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেন।

১৯৫২-এর রক্তাক্ত পথ ধরে, বীর বাঙালিদের সামনে হাজির হয় ১৯৭১ সাল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে পাকিস্তানি সেনারা পরাজয় বরণ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৭২ সালের ৬ই মে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আসেন। কলা ভবনের সামনে বটতলায় বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁকে ডাকসুর আজীবন সদস্য দেওয়া হয়। সংবর্ধনা সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর সামনে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিলের আদেশের নথিপত্র ছিড়ে ফেলা হয়। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর খাদ্য সংকট চলছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রী নিবাসে একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিছুদিন পরে ছাত্রছাত্রীরা দুবেলা ভাতের দাবিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুজাফফর আহমেদ চৌধুরীকে ঘেরাও করে। বঙ্গবন্ধু তখন প্রটোকল ছাড়াই উপাচার্যের বাসভবনে চলে আসেন। ছাত্রদের দুইবেলা ভাতের আশ্বাস দেন শেখ মুজিব। যে কারণে ছাত্ররা ঘেরাও কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৭২ সালের শেষভাগে ছাত্ররা অটোপ্রমোশনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপার্চায ও কিছু শিক্ষককে ঘেরাও করে। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছাত্রদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করেন। বঙ্গবন্ধুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেন। জারি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এসেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানায়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করেন। তখন বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে বরণ করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। জাতির পিতার সুভাগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত করা হয় পুরো ক্যাম্পাস। ১৯৭৫ সালের মধ্য-আগস্ট রাতে কতিপয় পথভ্রষ্ট সামরিক সেনা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার নৃশংসভাবে হত্যা করে। বীর বাঙালি জাতি হারায় তাদের মহাকালের মহানায়ককে।

২০১০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট সভায় বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার মহান সন্তান বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিভিন্নভাবে ধরে রেখেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে তাঁর জন্য একটি চেয়ার তৈরি করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ঐতিহাসিক চেয়ারটি যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেদিন বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি মানপত্রও দেওয়ার কথা ছিল। মানপত্রটি ২০১০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবুর রহমান হল প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৪ সালে হলটির নামকরণ করা হয় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল'। ১৯৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে স্মরণীয় করে রাখতেই ২০১৮ সালে রোকেয়া হলে ৭ই মার্চ ভবন উদ্‌বোধন করা হয়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু টাওয়ার। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মিলন সব্যসাচী: কবি, প্রাবন্ধিক, গীতিকার ও বঙ্গবন্ধু গবেষক

নব উদ্যমে ফিরছে বৈশাখ

শামসুজ্জামান শামস

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এই ছয় ঋতুর দেশে বৈশাখ প্রথম মাস। এই মাস কালবৈশাখির প্রলয় নৃত্য চারদিক জানান দিয়ে আসে। আসে বাংলা নববর্ষ। বিচিত্র জীবনবোধ ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময়তায় বর্ষবরণ আমাদের সর্বজনীন সংস্কৃতি, একই সুর ও সংগীতে, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতিতে এবং মনের মেলবন্ধনে বৈশাখ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাঙালির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। পহেলা বৈশাখ মানেই অসাম্প্রদায়িক এবং উঁচুনীচু, ছোটো-বড়ো ভেদাভেদহীন বাঙালির বাঁধভাঙা আনন্দের জোয়ার, উল্লাস-আড্ডায় ভরপুর উদ্বেলিত প্রাণে সুখের বারতা। বৈশাখ মানে আনন্দে উদ্বেলিত বাঙালির বুকভরা আশা আর রঙিন স্বপ্ন, বাঙালির হালখাতা, পুণ্যাহ আর মেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকা বাংলার বাতাসে বাতাসা, জিলাপি, মুড়ি-মুড়কি, খই, গজার গন্ধে মুখরিত থাকা চারদিক তালপাতার বাঁশি আর পালাগান, জারিগান, গাজিরগান, বাউলগান, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালিগানের সুর ভাসা হাটে-মাঠে-ঘাটে লালপেড়ে শাড়ি আর লাল-সাদা পাঞ্জাবির কড়কড়ে সুবাস ও রেশমি চুড়ির স্পন্দিত কলরোল থাকা কৃষ্ণচূড়ার লাল আর পাখির ডাকে হাস্যে-আনন্দে থাকা ঢোল, ডুগডুগির আওয়াজে উৎসবে রঙে উচ্ছ্বাসে ভাসা। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী বৈশাখ উদ্‌যাপনে পছন্দের পোশাক, সাজসজ্জাসহ বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে পরিচিত নানা পণ্য কিনে থাকে। বৈশাখের প্রথম দিন নানা আয়োজনে খাবার রান্নার প্রস্তুতি চলে। ফেরিওয়ালার ঝুড়ি থেকে ফুটপাথ, শপিংমল সব জায়গায় থাকে বৈশাখি বেচা-কেনার ধুম। প্রতিবছরের চিরচেনা সেই রূপ এবার ফিরছে নব উদ্যমে।

দুয়ারে কড়া নাড়ছে বঙ্গাব্দ ১৪২৯। বাঙালির মনে বিপুল সম্ভাবনার আলো জ্বালাতে আবারও আসছে বৈশাখ। নতুন বছরের প্রথম আলো আনে নতুন স্বপ্নের হাতছানি। পহেলা বৈশাখ– একটি নতুন বছরের সূচনা। প্রতিটি মানুষের প্রত্যাশা নতুন বছর যেন বয়ে আনে শুভ্রতা, মঙ্গল বারতা। এবার পহেলা বৈশাখে নতুন বছরকে বরণ করে নিতে চলে নানা ধরনের প্রস্তুতি। করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির কারণে বাংলা নববর্ষ বরণের উন্মুক্ত আয়োজন দুই বছর ছিল স্তিমিত। এ বছর সংক্রমণ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় ফের ফিরে আসছে মঙ্গল শোভাযাত্রা, ফিরে আসছে রমনা বটমূলের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালে মঙ্গল শোভাযাত্রা হয়নি। ২০২১ সালে হয়েছে সীমিত পরিসরে। তাই এবারের আয়োজন নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন আয়োজকেরা। 'নির্মল করো, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে'– প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত হবে এ বছরের বাংলা বর্ষবরণের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা ১৪২৯'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে চলছে বর্ষবরণের জোর প্রস্তুতি। অন্যদিকে রমনার বটমূলে প্রভাতি অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যস্ত ছায়ানট। এবারের বর্ষবরণে জড়তা-মলিনতা ঝেড়ে ফেলে নির্মলকে আহ্বান করা হচ্ছে।

এবছর সব কিছু অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। সেজন্য এবার স্বাভাবিক সময়ের মতোই মঙ্গল শোভাযাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে যে সড়কে আগে মঙ্গল শোভাযাত্রা হতো, সেই সড়কে মেট্রোরেলের কারণে এখন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। এ বছর তাই শোভাযাত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে শুরু হয়ে উপাচার্যের ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হবে। এছাড়া করোনা পরিস্থিতি কারণে সামাজিক দূরত্বের বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে। করোনাকালে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে এবং রাষ্ট্রীয় বিধান মেনে ছায়ানট দুবছর বর্ষবরণের অনুষ্ঠান স্বল্প পরিসরে অনলাইনে আয়োজন করেছে। এবছর করোনা পরিস্থিতি অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। দুই বছর পর পহেলা বৈশাখের উৎসব আয়োজন ফিরে আসায় ছায়ানটের কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভালো লাগা কাজ করছে। এবছর আগের মতোই জমজমাট পহেলা বৈশাখ হবে বলে আশা করছেন তারা।

পহেলা বৈশাখ ভিন্ন দ্যোতনা নিয়ে আসে। পহেলা বৈশাখ পুরানো জরাজীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের যাপিত জীবনে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতেই শুধু নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে একাকার হওয়ার প্রেরণাও জোগায়। তাই পহেলা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড়ো অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন উৎসব। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস হাজার বছরের। সমৃদ্ধ এই সংস্কৃতির সঙ্গে বর্ষবরণ উৎসব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পহেলা বৈশাখ বাঙালি

ঐতিহ্যের অহংকার। 'ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর'– কবির এ বাণী হৃদয়ে ধারণ করে, পুরোনো জরা ও গ্লানি ঝেড়ে ফেলে বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। পুরাতন বছরের জরা, ক্লান্তি, গ্লানিকে পেছনে ফেলে চির নতুনের আহ্বান নিয়ে বছর ঘুরে আসে পহেলা বৈশাখ।

এবার রাজধানীর রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে দিনব্যাপী বাংলা নববর্ষের উৎসব। ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণি-পেশা, বয়স-নির্বিশেষে সব মানুষ শামিল হন বৈশাখি উৎসবে। বাংলা নববর্ষে দেশজুড়ে নানা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। দোকানিরা সারা বছরের হিসাব মিলিয়ে খুলেন নতুন খাতা। বিভিন্ন স্থানে বসে বৈশাখি মেলা।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য মোগল সম্রাট আকবরের আমলে বৈশাখ থেকে প্রবর্তন হয়েছিল বাংলা সালের। বর্ষ শুরুর সেই দিনটিই এখন বাঙালিদের প্রাণের উৎসব। বাদশাহ আকবরের নবরত্ন সভার আমির ফতেহ উল্লাহ সিরাজী বাদশাহী খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য ফসলি সালের শুরু করেছিলেন হিজরি চান্দ্রবর্ষকে বাংলা সালের সঙ্গে সমন্বয় করে। তিনি পহেলা বৈশাখ থেকে বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু করেছিলেন। আর বৈশাখ নামটি নেওয়া হয়েছিল 'বিশাখা' নক্ষত্রের নাম থেকে। নববর্ষের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। বাংলা সালের প্রবর্তন হয় খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে। বৈশাখি মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক ধরনের প্রাণসঞ্চার হয় প্রতিবছর। হস্তশিল্পের প্রসারে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে শহরাঞ্চলে বুটিক ও ফ্যাশন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ার খবরও উৎসাহব্যঞ্জক। ব্যাবসা সম্প্রসারণ ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে এ শিল্প। এসব কর্মকাণ্ড আমাদের সংস্কৃতিতে যুক্ত করছে নতুন মাত্রা। বিদেশে বাংলাদেশের কিছু মিশন নববর্ষ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে পরিচয় করিয়ে দিতে ভূমিকা রাখছে। বৈশাখ আপন শিল্প-সংস্কৃতির ধারাকে ঋদ্ধ ও বেগবান করার শপথ নেওয়ার দিন। রমনার অশ্বত্থমূলে দিনটির সূচনা হবে ৫৫ বছরের ঐতিহ্য অনুসারে ছায়ানটের বর্ষবরণ সংগীত আয়োজনের মধ্য দিয়ে। রমনামুখী লাখো মানুষের ঢল উৎসবকে করে তুলবে আরও বর্ণিল। রমনার অশ্বত্থমূলে ১৯৬৭ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার নব-উন্মেষকালে ছায়ানট সেই যে কাকভোরে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষ বরণের আবাহনী গান গেয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, সেটি আজ রাজধানীবাসীর সবচেয়ে বড়ো উৎসবের কেন্দ্র। রমনা এখন নববর্ষে লোকারণ্য। সমগ্র রাজধানীর পথ মিশে যায় রমনায় এসে। পৃথিবীর অনেক জাতির নিজস্ব কোনো নববর্ষ নেই। এই দিক দিয়ে আমরা সৌভাগ্যবান। আসলে বাংলা সালের উৎপত্তি হয়েছে এই দেশের মানুষের জীবনধারা এবং প্রকৃতির বিচিত্রতার নিরিখে। প্রধানত ফসলের মৌসুম চিহ্নিতকরণ ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে মুসলিম শাসনামলে বাংলা পঞ্জিকার প্রবর্তন করা হলেও তা এখন মিশে গিয়েছে সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায়। চৈত্রে রবিশস্য, বৈশাখে বোরো ধান, জ্যৈষ্ঠে পাকা আম-কাঁঠাল, আষাঢ়-শ্রাবণে ঘনঘোর বরিষা ও নদী জল ছল ছল, শরতে কাশবনে বাতাসের দোলা, অগ্রহায়ণে নবান্নের উৎসব, পৌষে পিঠাপুলির ধুম, মাঘে কনকনে শীত– এসবই আমাদের লোকায়ত জীবনধারার অতি পরিচিত অনুষঙ্গ। প্রকৃতিতে বৈশাখ আসে কালবৈশাখির আশঙ্কা সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু বাঙালি জীবনে বৈশাখ আসে জীবন সংগ্রামের অফুরান প্রেরণা সঞ্চারিত করে।

আবহমান বাংলার হাজার বছরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাঙালি বরণ করে নতুন বছরকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জীবন-জগতে স্বপ্নময় নতুন বছরের শুভযাত্রা সূচিত হয় এই বৈশাখে। বৈশাখের প্রথম দিবসটি আবহমান কাল থেকেই আমাদের সত্তায়, চেতনায় ও অনুভবের জগতে এক গভীরতর মধুর সম্পর্ক নিয়ে বিরাজ করছে। বাঙালির জীবনে ঐতিহ্যের রং আর রূপ নিয়ে আসে পহেলা বৈশাখ। রাজধানীসহ সারা দেশের মানুষ বাংলা গান, কবিতা, শোভাযাত্রা, নাচসহ নানান আয়োজনে দিনটিকে উদ্‌যাপন করে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা এদিনে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এছাড়াও সকল সরকারি-বেসরকারি টিভি ও রেডিও স্ব স্ব উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করে থাকে। এছাড়া বিভাগীয় শহর, ঢাকা মহানগর, দেশের সব জেলা ও উপজেলায় পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নানা বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা ও গ্রামীণ লোকজ মেলার আয়োজন করা হয়।

পহেলা বৈশাখে ঘরে-বাইরে প্রায় সমানতালে খাবারের আয়োজন থাকে। এ আয়োজন বিভিন্ন ধরনের রেস্তোরাঁ-হোটেলের ব্যাবসা বাড়িয়ে দেয়। এমনকি পাঁচ তারকা হোটেলগুলোতেও থাকে নানা আয়োজন। আর মিষ্টির দোকানের বিকিকিনির বিষয়টি তো বহু আগে থেকেই পহেলা বৈশাখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পান্তা-ইলিশ পহেলা বৈশাখের উৎসবের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে।

মেলা হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের জীবনের সঙ্গে মেলার যোগ দীর্ঘকালের। উৎসব, বিনোদন, বিকিকিনি আর সামাজিক মেলামেশার উদার ক্ষেত্র হচ্ছে মেলা। বিভিন্ন পার্বণে মেলা হয়ে থাকে। নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখি মেলা বাঙালির চেতনাকে উজ্জীবিত করে। মেলার অর্থ মিলন বা সম্মিলন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মেলা হয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হয় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। মেলায় শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীসহ মানুষের বিশাল সমাবেশ ঘটে। শিশুরা বাবা-মার হাত ধরে কিংবা কোলে বা কাঁধে চড়ে মেলায় এসে নির্মল আনন্দ লাভ করে।

মেলায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত হরেক রকম পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি ছাড়াও আগতদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা ব্যবস্থা করা হয়। অতীতে মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হতো কবিগান, জারিগান, পালা গান, বাউলগান, পুতুলনাচ, সার্কাস, যাত্রা, গাজীর পটসহ অন্যান্য গান। বিনোদনের জন্য আরও থাকত বায়োস্কোপ, নাগরদোলা, কুস্তি, কাবাডি, ঘুড়ি ওড়ানো ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, ষাঁড়ের লড়াই ও মোরগের লড়াই। এর সবকিছু না হোক কোনো কোনোটি এখনও টিকে আছে। মেলা উপলক্ষে যেসব খাবার, খেলনা ও কারুপণ্য তৈরি হয়, তা আমাদের কৃষ্টির অন্যতম উপাদান। অনেক ক্ষেত্রে মেলা আয়োজনেও এসেছে নতুনত্ব। আগের অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটলেও বৈশাখি মেলা এখনও জমজমাট। সর্বস্তরের সব বয়সের মানুষের কাছে মেলা অনাবিল আনন্দের উৎস হিসেবে চিহ্নিত। এ মেলার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থার পরিচয় মেলে।

শামসুজ্জামান শামস: সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক, bk.shams@yahoo.com

সালাত ও সিয়াম

মুহাম্মদ ইসমাঈল

সালাত ও সিয়াম যেন জীবন-পাখির দুটি ডানা। এই দুটি ডানা দিয়ে মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের বিশাল আকাশ অতিক্রম করতে পারে। বিশ্ববিধান আল-ইসলামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই সালাত (নামাজ) ও সিয়াম (রোজা)।

সালাত নদীর স্বচ্ছ সলিলে সিক্ত হয়েই মানবাত্মা সতেজ ও সুন্দর হয়ে ওঠে। আর সিয়ামের সাধনা মানে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে মিলনের নিবিড় সাধনা। মানুষের মনোজগত ও বস্তুজগতের মাঝখানে যে নিবিড় মগ্নতা আছে, সালাত ও সিয়াম সেই মগ্নতার মাঝে নিয়ে আসে অনন্ত আলোর প্রবাহ। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার স্মরণের জন্য সালাত আদায় কর'। সালাতের মাঝে পঠিত *আল-কোরানের* সুধাময় বাণীসমূহের যথেষ্ট অনুধাবন আল্লাহর স্মরণের পথকে প্রশস্ত করে। সালাতের উচ্চারিত মহান আল্লাহর নামসমূহ অন্তর্লোকে যে অনুভূতির সঞ্চার করে তার মাঝে মানবাত্মা আল্লাহর বিরাটত্ব অনুধাবনে সক্ষম হয়। আল্লাহর প্রেরিত বাণী থেকে ফায়দা লাভের জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের পর সালাত প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সালাতের পাঠশালাতে আল্লাহর বাণীসমূহের নিবিড় অনুধাবন আল্লাহর ওহী থেকে ফায়দা লাভের ক্ষেত্র তৈরি করে।

চাঁদনী রাতে জ্যোৎস্নালোকে গুবাক তরুর সারি যেমন রুপালি আলোতে ঝলসে ওঠে, সালাতের মাঝেও মানবাত্মা আখেরাতের অপরূপ আলোতে ঝলসে ওঠে। মানুষের দৈহিক সত্তার মাঝে যে আত্মার অবস্থান, সে আত্মা পার্থিব জীবনে সমাজ-সংসারে মগ্ন থাকলেও মরণের সাথে আরেক অনন্তলোক আখেরাতে পাড়ি জমায়। সেখানে নির্দিষ্টকালের অবস্থানের পর মহাপ্রলয়ের দিন রোজ কেয়ামতের মাঠে আর এক নতুন দেহ ধারণ করে তার উত্থান সংঘটিত হবে। এই সত্যকে মানুষ দিবস-রজনিতে পাঁচ বার সালাতের মাঝে অনুধাবন করে থাকে। যে সূরা 'ফাতিহা' ছাড়া সালাত আদায় পূর্ণ হয় না, সেই সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াতে উপরোক্ত সত্য বাণী অনুরণিত হয়েছে। সূরা ফাতিহার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যেমন– কানজুল কোরান, আসাসুল কোরান, উম্মুল কোরান ইত্যাদি। কিন্তু *কোরানে* সূরা হিজরে সূরা ফাতিহার একটা নাম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সে নামটি হলো 'সাবউল মাছানী' অর্থাৎ নিত্য-পাঠ্য বাণী সপ্তক। নামাজে সূরা ফাতিহা বার বার পাঠ করা হয় বলেই এর নাম হয়েছে 'নিত্য-পাঠ্য বাণী সপ্তক'। এই জন্য খুব কম মুসলিমই এমন আছেন যিনি সূরা ফাতিহা জানেন না। *কোরান*-জননী সূরা ফাতিহা, *কোরানের* ভিত্তি সূরা ফাতিহা। পাঠ শেষে সালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ সূরা ফাতিহা। যে মানুষ সূরা ফাতিহার সাগর সৈকতে অবগাহন করে তার মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলো, সে সালাতের সৌন্দর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হলো। জীবন, মরণ ও বিশ্বলোক সম্পর্কে *কোরানের* ঘোষণা সূরা ফাতিহার মাঝে উচ্চারিত হয়েছে। এইজন্য একজন বিশ্ববাসীকে সালাতের সাধনায় সফল হতে অবশ্যই সূরা ফাতিহার অর্থ ও ব্যাখ্যা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। অবক্ষয়ী ভ্রান্ত বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের ঘুনে ধরা সভ্যতার উপর প্রত্যয়বাদের ইমারত নির্মাণ করতে হলে অবশ্যই সালাতের অপরিহার্য অংশ সূরা ফাতিহার শিক্ষা অনুধাবন করতে হবে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। যে বিশ্বলোকে আমরা প্রতিনিয়ত অবস্থান করছি তার যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যার অপার করুণা-সিন্ধু আমাদের জীবন-মনকে সিক্ত করছে, এই জগৎ অনন্তকালের জন্য নয়। এর পরিসমাপ্তি আছে। আর সেই সমাপ্তি দিবসের নাম 'ইয়াওমুদ্দীন' প্রতিফলন দিবস। যার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ। যিনি সর্বপ্রকার অংশীবাদীতার ঊর্ধ্বে। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, এই জন্যই সূরা ফাতিহায় মানবাত্মার আকুল আবেদন উচ্চারিত হয়েছে– আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থী। জীবন, মরণ, সমাজ, সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে এই উচ্চারণ পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। সালাতের তৌহিদি উচ্চারণ আমাদের জীবন-মনন-সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে।

সালাতের সাথে সাথে আসে সিয়ামের (রোজার) কথা। সিয়ামের এক মাস সত্য-সাধনার সুবর্ণ সময়। সিয়ামের পরতে পরতে *কোরানের* ফল্গুধারা সঞ্চারিত। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'রমজান মাস– সিয়ামের মাস সেই মাস যে মাসে *কোরান* অবতীর্ণ হয়েছে।' এত মাস থাকতে কেন সিয়ামের মাসে *কোরান* অবতীর্ণ হলো? কারণ *কোরানের* জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত না হলে কোনো সাধনাই পূর্ণতা পায় না। তাই সিয়ামের সাথে *কোরান* পাঠ ও বাস্তবায়নের চেতনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সূরা সাদের ২৯নং আয়াত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ বলেন, 'আমি এই মুবারকময় *কোরানকে* অবতীর্ণ করেছি এই জন্যই যে, এর আয়াতগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা হবে এবং জ্ঞানীলোকগণ তা স্মরণ করবে।' *আল-কোরানের* চিন্তাধারা বা চিন্তাপ্রবাহ সিয়াম সাধনার সকল পর্যায়কে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। সিয়ামের মাস যেন *কোরান* অনুধাবনের মাস। এই এক মাসব্যাপী আমাদের আত্মা *কোরানের* দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। আর এই সক্রিয় সচেতন আলোকপ্রাপ্ত আত্মা নিয়েই আমরা সিয়ামের মাসের পরবর্তী সময় বা মাসগুলো অতিক্রম করি।

শুরুতেই যে কথা বলেছিলাম, সালাত ও সিয়াম জীবন-বিহঙ্গের দুটি ডানা; সে কথার সত্যতা এতক্ষণে কিছুটা হলেও প্রমাণিত হয়েছে। জীবন জগতের নিবিড় মগ্নতার মাসে আলোকিত ও প্রসারিত মুক্তির ছায়াপথ আমরা সালাত ও সিয়ামের জ্যোৎস্নালোকে চিনে নিতে পারি। চিনে নিতে পারি জীবনের পরম সত্যকে। আমাদের চিন্তা দর্শনের দীনতা দূর করে একমাত্র সিয়ামের মাধ্যমেই আমাদের হৃদয়কে ঈমানের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারি। আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দিন।

ঘরের যেমন খুঁটি থাকে, তেমন দীন-ধর্ম জীবন বিধান আল-ইসলামের খুঁটি হলো সালাত। আল্লাহর রাসূল (স.) তাই বলেছেন, 'সালাত দীনের খুঁটি স্বরূপ, যে সালাতকে ঠিক রাখল সে দীনকে ঠিক রাখল, আর যে তা ধ্বংস করল সে দীনকে ধ্বংস করল।' সূরা আনকাবুতে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও দুষ্কর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখে'।

সিয়ামও অনুরূপ। আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন, 'সিয়াম বা রোজা ঢাল স্বরূপ'। মানুষ নাফসের সাথে যুদ্ধে এই সিয়ামের ঢালের মাধ্যমেই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই ঢাল আর কিছু নয়, সিয়ামের মাধ্যমে অর্জিত তাকওয়া।

সালাতের সামাজিক ও সাংগঠনিক গুরুত্বও অপরিসীম। সংগঠিত জামায়াতবদ্ধ জীবনযাপনে মুসলমানদের অভ্যস্ত করে তোলার জন্য *কোরান*-হাদিসে জামায়েতের সাথে সালাত আদায়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্তের সালাত যেমন জামায়াতের সাথে আদায় করতে হবে, তেমন জুম্মা ও দুই ঈদের সালাত বা নামাজও জামায়াতের সাথে আদায় করতে হবে। বিশেষ করে জুম্মার সালাত মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক সম্মেলন আর দুই ঈদের সালাত বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনে এসে মানুষ খোতবার শিক্ষা শ্রবণ করে থাকে। এই জন্যই দুই খোতবার প্রথম খোতবাটি অবশ্যই মাতৃভাষায় প্রদান করা দরকার। দোয়া-দরূদ সংবলিত দ্বিতীয় খোতবা আরবি ভাষায় দিতে হবে। জুম্মার সালাতে প্রদত্ত এই খোতবার শাব্দিক অর্থ বক্তৃতা। অতএব এই বক্তৃতা যেন মুসলিম শ্রোতাগণ অনুধাবন করতে পারেন সেইদিকে খেয়াল রাখতে হবে। দীনের শিক্ষা বিস্তার ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খোতবার ভূমিকা তাই অপরিসীম।

সমাজে দীনি শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিস্তারে এই খোতবাকেই তাই আরও পরিপূর্ণ ও অর্থবহ করে তুলতে হবে। দীনের আংশিক বক্তব্য নয়, পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যই খোতবার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। মসজিদ হলো সমাজের হৃদপিণ্ড। দেহের রক্ত কণাগুলো যেমন হৃদপিণ্ডে এসে পরিশোধিত হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি বিশ্বাসী মানুষও মসজিদে এসে দীনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা নিয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়েন। সমাজ সংস্কারে আল্লাহ প্রদত্ত এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে আমরা সুষ্ঠুভাবে চালু রাখতে পারলে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দিন। আমিন।

মুহাম্মদ ইসমাঈল: কবি, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক

উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, সামাজিক সূচক, প্রযুক্তি, ব্যাংকিং, গ্রামীণ উন্নয়ন বা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে ২৯শে মার্চ বিদেশি অতিথিবর্গের সম্মানে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আয়োজিত স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লাহ শহীদ। অনুষ্ঠানে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের শতাধিক রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি এবং জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়' উল্লেখ করে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, বহুপাক্ষিকতার প্রতি যে অবিচল বিশ্বাস তা এই আদর্শ থেকেই এসেছে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, জাতিসংঘ সনদে যে মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে তা বাংলাদেশের জনগণের আদর্শ।

ফাতিমা বলেন, জাতির পিতার সেই আদর্শিক মর্মবাণী আজও উজ্জ্বল। তিনি বলেন, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলাই বাংলাদেশের লক্ষ্য। শান্তিরক্ষা এবং শান্তি বিনির্মাণ ইস্যুতে নেতৃত্ব; শান্তির সংস্কৃতি এবং বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আমাদের আহ্বান; ভ্যাকসিন সমতা, ডিজিটাল বিভাজন দূর করা, জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয় ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে নেওয়া, অভিবাসন সমস্যা ও অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা, লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা এবং শিশুদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সর্বদাই সোচ্চার। তিনি মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ১০ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাহসী সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন।

স্বাধীন দেশ হিসেবে ৫১ বছরের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশে যেসকল পরিবর্তন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন হয়েছে তা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবেদন: জে আর পঙ্কজ

পহেলা বৈশাখ আমাদের আত্ম-জাগরণ

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

মানুষের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হলো ভাষা। আর এই ভাষাই হলো কোনো দেশ ও জাতির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কেননা মানুষ যখন পরস্পরেরর সঙ্গে মিলিত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার কথা বলে, নিজের ভাবের আদান-প্রদান করে তখনই তারা স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর এই সামাজিক বন্ধনের ভেতর দিয়েই মানুষ তার জীবন, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শে বিকশিত হয়ে থাকে। যার ফলে মানুষের বিকাশের সঙ্গে তার চিত্তের যে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ঘটে তা থেকে কোনো দেশ ও জাতির সংস্কৃতিকে গড়ে তোলে। সেই সংস্কৃতির মধ্যে যেমন আছে বহির্জীবনের কর্ম সাধনার দিক, তেমনি আছে মানস সাধনার দিকটিও। সেই জাতির সংস্কৃতির মুকুরেই ধরা পড়ে জাতির মানস প্রবণতা, অনুষ্ঠানময় সামাজিকতা, শিল্প-সাহিত্যের কারু-কৃতি, ধর্মের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সমুন্নতি। তাই সংস্কৃতি একটি জাতির প্রাণসত্তার কর্মময় ও চিন্ময় অভিব্যঞ্জনা। জাতির সংস্কৃতির তারেই বেজে ওঠে তার জাতিসত্তার মর্মরধ্বনি।

পৃথিবীর প্রতিটি জাতির যেমন রয়েছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, তেমনি রয়েছে তার একটি নিজস্ব ভাষা। আর এই ভাষাকে কেন্দ্র করেই তার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আর এই ভাষাই হলো কোনো জাতির সংস্কৃতির মূল চালিকাশক্তি। ভাষাকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি এক পা-ও এগুতে পারে না।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির মতো আমাদেরও রয়েছে হাজার বছরের স্বপ্নে লালিত পুরানো একটি সংস্কৃতি এবং একটি নিজস্ব ভাষা। এই সংস্কৃতি ও ভাষা আমাদেরকে স্নেহময়ী জননীর মতো সুদীর্ঘকাল ধরে লালন করে আসছে। এই ভাষার কারণেই আজ পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে। এই ভাষাই বাঙালিকে জুগিয়েছে ভাষা আন্দোলনের অফুরন্ত শক্তি ও সাহস। আর এই ভাষা আন্দোলনই বাঙালিকে দিয়েছে তার আপন সত্তা আবিষ্কারের মহিমা, তার জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা লাভের অফুরন্ত জাতীয় চেতনা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিল বাঙালি সংস্কৃতি ও তার জাতিসত্তাকে ধ্বংস করতে না পারলে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হবে না। পাকিস্তানি স্বার্থান্বেষীরা তাদের স্বার্থের বেদিমূলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে যতবার বলি দিতে চেয়েছে, ভাষা আন্দোলনের রস সিঞ্চিত বাংলার জাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ততবারই তাদেরকে হঠিয়েছে। বাংলার মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছিল তার ভাষা আন্দোলন হলো তার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও তার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। আরও উপলব্ধি করেছিল তার রাজনৈতিক চেতনা, তার বাঙালি জাতীয়তাবোধ, তার সংস্কৃতির অতন্দ্র প্রহরী। এই সংগ্রামী চেতনাই বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের এই দুই ধারাকে একসূত্রে গ্রথিত করে মুক্তিসংগ্রামের মোহনায় এনে দিয়েছিল। এই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাঙালির প্রতিবাদী চেতনা শানিত ও মহিমান্বিত হয়েছিল। বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে আঘাত করার কারণেই বাঙালির আত্মজাগরণ এসেছিল। যার ফলে বাঙালিরা প্রথমেই ভাষা আন্দোলনে জীবন-মরণপণ রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল। আজ পৃথিবীর মানচিত্রে যেমনিভাবে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তেমনিভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথা। এই ভাষা আন্দোলনের কারণেই বাংলার আকাশে চিরদিনের মতো হয়ে রইল– একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, শোষণের বিরুদ্ধে আপোশহীন সংগ্রামের প্রতীক। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বাঙালির ইতিহাসকে কেউ-ই মুছতে পারবে না। তাই আজ আমরা পৃথিবীর দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে বলতে পারি– একুশ আমাদের জাতীয় চেতনা আর স্বাধীনতা আমাদের অহংকার।

এই জাতীয় চেতনা ও আত্ম-জাগরণের মূলে রয়েছে আমাদের 'মাতৃভাষা'। এই মাতৃভাষাই দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রেরণা, শক্তি ও সাহস। আমরা যে মতের বা ধর্মের অনুসারী-ই হই না কেন, আমাদের মাতৃভাষাই আমাদের জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করেছে। আমাদের সবার মধ্যেই এই বোধ কাজ করেছে যে– আমরা বাঙালি, আমরা এই বাংলার মানুষ, আমরা এই বাংলায় বাস করি। আর এই বাংলা ভাষা হলো আমাদের মাতৃভাষা, বাঙালিত্ব হলো আমাদের জাতীয় পরিচয়। আর এই বাংলার সংস্কৃতিই হলো আমাদের সংস্কৃতি। এই আত্ম-জাগরণের ফলেই আজ আমরা দল, মত, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভাষা দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নববর্ষ ইত্যাদি একত্রে মিলিত হয়ে পালন করতে পারছি। বাঙালি জাতীয়তাবোধই আমাদের সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে।

বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি জাতীয় উৎসব, যে উৎসব বাঙালির জাতীয় জীবনে একটি আনন্দময় উৎসব হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে এবং বাংলা সংস্কৃতির উজ্জ্বল আভায় সকল বাঙালিকে আলোকিত করে আসছে।

পহেলা বৈশাখ হলো আমাদের বাঙালির জীবনের নব চেতনার আলোকে নতুন জীবনের অবগাহনের দিন। এই দিনটি বিগত বছরের সকল জরাজীর্ণতাকে পেছনে ফেলে, সকল দুঃখ-বেদনাকে একরাশ হাসি, আনন্দ আর গান দিয়ে ঢেকে দিয়ে আনন্দের নব তরঙ্গে মঙ্গলের ঘণ্টাধ্বনি বাংলার পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার দিন। এই দিনে বাংলার সমস্ত মানুষ এসে দাঁড়ায় এক নতুন চেতনার দ্বারে। এই দিনে চির নতুনকে বরণ করে নেওয়ার আর্তি নিয়ে বাঙালিরা আকুল হয়ে ওঠে। কারণ, এই দিনটি বাঙালির জীবনে নতুন সম্ভাবনাময় উৎসবের দীপাবলি জ্বালিয়ে নতুন আশার আলো নিয়ে আসে। তাই পহেলা বৈশাখ দিনটি বাঙালির জীবনের নব উন্মেষের দিন, নবজাগরণের দিন। এই দিনটিতে বাঙালির জীবনের যেন নতুন সূচনা হয়। তাই নববর্ষ আমাদের জাতীয় জীবনে পরম আনন্দের দিন।

বাংলা নববর্ষ আসে আনন্দের পসরা নিয়ে। বৈশাখের প্রথম প্রভাতের আগমনে আমাদের মনেপ্রাণে জাগায় আনন্দের শিহরণ। নববর্ষকে আনন্দঘন চিত্তে গ্রহণ করার জন্যে এই দিনটিতে আমরা নানা উৎসবের আয়োজন করি, যাতে আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন যেন ভালোভাবে কাটে। আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি– বছরের প্রথম দিনটি যদি ভালোভাবে আনন্দ-উৎসবে কাটে তবে সারা বছরটিও আমাদের ভালোভাবে কাটবে। তাই এই দিনে সকলেই ভালো খায়, ভালো পরে, ভালো ব্যবহার করে এবং আনন্দ-ফুর্তিতে কাটাবার চেষ্টা করে। তাই এই দিনটি যাতে ভালোভাবে উপভোগ করা যায় সেজন্যে আমরা নানা উৎসব, মেলা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি।

আমাদের পারিবারিক জীবনেও আমরা বিশেষ খাবারদাবারের আয়োজন করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আপনজনকে নিমন্ত্রণ করে থাকি। সকল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে আনন্দ পাই। এই ক্ষুদ্র আয়োজনের মধ্য দিয়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই। যার ফলে আমাদের সকলের হৃদয়ে দেখা দেয় এক আত্ম-জাগরণ। এই আত্ম-জাগরণের মূল ভিত্তিই হলো আমাদের মাতৃভাষা। আর এই মাতৃভাষার বেদিমূলেই আমরা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে একত্রে মিলিত হতে পারি। মাতৃভাষাই আমাদেরকে আমাদের সংস্কৃতির উৎসের সন্ধান দিয়ে থাকে। সুতরাং বাংলা নববর্ষ আমাদের বাঙালির জাতীয় জীবনে এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলা নববর্ষের মেলা আমাদের দেশে এক প্রাচীন ঐতিহ্য। নববর্ষের দিনে গ্রামগঞ্জে, শহর-বন্দরে মেলা বসে। সেখানে সমাবেশ ঘটে দেশে তৈরি নানা জিনিসের ও কুটিরশিল্পজাত নানা পণ্যের। ছোটোদের রং-বেরঙের খেলনা ও নানা খাদ্যদ্রব্যে মেলা ভরে ওঠে। বিচিত্র সমাবেশ ঘটে ছেলে-বুড়ো সকলের। শিশুরা কিনে নানা রং-বেরঙের খেলনা, তারা মনের আনন্দে নাগরদোলায় দোলে। বিচিত্র অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে পুরো মেলাটি। ছেলে-বুড়ো সকলের আনন্দ কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে বৈশাখি মেলা। আজ গ্রামগঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্রই এই মেলা প্রত্যক্ষ করা যায়। মেলায় মেলায় ভরে ওঠে সারা বাংলাদেশ। এই মেলাতেই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, পরস্পরে ভাব বিনিময় হয়। এ যেন আমাদের সকলের এক মহামিলন ক্ষেত্র। আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে সেই আনন্দে আমরা মাতোয়ারা হয়ে উঠি। যার ফলে এই নববর্ষের আনন্দ আমাদের জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে এক অপূর্ব আত্ম-জাগরণ। সেখানে নেই কোনো দ্বেষ, নেই কোনো হিংসা, নেই কোনো শ্রেণিভেদ। সেখানেই আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি– আমরা একই মায়ের সন্তান। এই বাংলা আমাদের মা। আজও এই নববর্ষ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে, আমাদের সকলের হৃদয়ে জাগায় নবীন শিহরণ। তাই বাংলা নববর্ষ আমাদের জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এক ঐতিহ্যবাহী উৎসব। এই উৎসব আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

এছাড়াও একটি উৎসব রয়েছে– তা হলো নববর্ষের হালখাতা। যদিও এই ধরনের উৎসব আজ দিন দিন লোপ পেয়ে যাচ্ছে, তবুও অনেক ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবটি পালন করে আসছে। এই নববর্ষের দিন ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠান নানা সাজে সাজানো হয়, সকল খদ্দরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এখানেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নববর্ষের আনন্দকে ভাগাভাগি করে উপভোগ করি। এটিও আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির একটি অন্যতম উৎসব। এই উৎসবও আমাদের জাতীয় জীবনে এনে দেয় এক নতুন জাগরণ। আমাদের আত্ম-জাগরণের ক্ষেত্রে এর প্রভাবও কম নয়।

প্রাকৃতিক উৎসব হলো বাংলা নববর্ষ। এই নববর্ষের দিনে বাংলার চারদিকে প্রকৃতির মাঝে দেখা যায় নতুনের আবির্ভাব। নতুন সাজে সেজে ওঠে বাংলার প্রকৃতি। আর এরই অংশ হিসেবে গাছে গাছে শোভা পায় নতুন পাতা ও নতুন কুঁড়ি। এই সময় প্রকৃতিতে যেমন দেখা যায় নতুনের সমারোহ তেমনিভাবে আমাদের জীবনেও দেখা দেয় নতুনের শিহরণ। এই নতুনকে বরণ করার জন্য আমরা আকুল হয়ে উঠি। এই প্রাকৃতিক উৎসব পালনের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁকে অনুসরণ করেই তাঁর প্রেরণাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ঢাকায় গড়ে উঠেছে ছায়ানট। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের পটভূমিকায়। আর তা করতে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে থেকে এসেছিল সহস্র বাধা। কিন্তু সকল বাধাকে উপেক্ষা করে বাংলার মানুষ এগিয়ে এসেছিল রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালন করতে। আর এই পটভূমিকাতে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ছায়ানট। ছায়ানট শুধু একটি সংগীত প্রতিষ্ঠান নয়, ছায়ানট একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, যা সকল বাঙালিকে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর পথে আসতে পথ দেখিয়েছিল। এই পথটিকে অবলম্বন করেই আজ কয়েক দশক যাবৎ রমনা বটমূলে নামে লাখো মানুষের ঢল। আর আমরা এই জনসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাঝে মহাআনন্দে ভেসে বেড়াই। রমনার এই বটমূল আমাদের সকল বাঙালির মহামিলন ক্ষেত্র। এই মহামিলন ক্ষেত্রটি প্রত্যক্ষ করলেই বোঝা যায়, বাঙালি জাতির সংস্কৃতির গভীরতা কতটুকু। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়– বাংলা নববর্ষ বাঙালি জাতির যেমন পরম আনন্দের উৎসব, তেমনিভাবে এটি বাঙালি জাতির আত্ম-জাগরণের উৎসব।

পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে এক ঐতিহ্যবাহী অনাবিল আনন্দের উৎসব। তাই বলে এটি শুধু গান বাজনা বা মেলা নয়, এটি শুধু রমনা বটমূলে ভোরবেলায় বিপুল ও বৈচিত্র্যময় কোনো অনুষ্ঠানমালা নয়। এই সকল আয়োজনের গভীরেই রয়েছে আমাদের জাতীয় জাগরণের আলোকময় দ্যুতি। এটি আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে বাঙালি চেতনাকে বিকশিত করে। আমাদেরকে সামনে চলার প্রেরণা দিয়ে প্রথম প্রভাতে জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করতে শেখায়। জীবনের নতুন তাৎপর্য উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে পহেলা বৈশাখের স্বরূপ।

পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই আসুন, আমরা পহেলা বৈশাখকে বিপুল সমারোহে পালন করে আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ধারাকে সমুজ্জ্বল রাখি। এই নতুন বছরের নতুন দিনে সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা।

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর: অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যানেজার, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট, কবি ও প্রাবন্ধিক, gopeshsutradhar810@gmail.com

বৈশ্বিক সুখী দেশের সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি

ফারিহা হোসেন

সাধারণের ধারণা সুখ ব্যক্তি অনুভূতি, ব্যক্তিগত ভালোলাগার ওপর নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিবছর বিশ্বের সুখী দেশের তালিকা প্রকাশ করে। এজন্য একটি বিশেষ দিবস পালন করা হয়। ২০শে মার্চ ছিল বিশ্ব সুখ দিবস। বিশ্বের সুখী দেশের তালিকায় ২০২২ সালে ৭ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৯৪তম। গতবছর এ অবস্থান ছিল ১০১তম। সুখের পরিমাপক হিসেবে একটি দেশের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক উদারতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মোট দেশজ উৎপাদন-জিডিপি, গড় আয়ু ও দুর্নীতি দমনের মতো বিষয়গুলোকে সামনে রাখা হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জন আমাদের জন্য সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। বিজয়ের ৫০ বছরে বাংলাদেশ সকল সূচকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। দারিদ্র্যমোচন, শিক্ষার প্রসার, নারী উন্নয়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে প্রিয় স্বদেশ। জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের যে পরিচিতি ছিল তা পালটেছে ব্যাপকভাবে। ৭০-এর দশকে স্বাধীন বাংলাদেশকে খাদ্যঘাটতি, দুর্ভিক্ষ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত এক জনপদ হিসেবে জানত বিশ্ববাসী। ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১২৯ ডলার। পঞ্চাশ বছর পর এসে মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১৬ গুণ, অর্থাৎ ২,৫৯১ ডলার। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত হতে জাতিসংঘের ৩টি শর্তের প্রথমটি হচ্ছে মাথাপিছু আয়। এরপর অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন। মাথাপিছু আয়ে শর্ত পূরণে ন্যূনতম দরকার এক হাজার ২শ ৩০ ডলার। বর্তমানে ২,৫৯১ ডলার। অর্থনৈতিক ঝুঁকি কতটা আছে সেটা নিরূপণে ১০০ স্কোরের মধ্যে ৩২-এর নিচে স্কোর হতে হয়। বাংলাদেশ সেখানে নির্ধারিত মানের চেয়েও ভালো রয়েছে। অর্থাৎ ২৫.২ স্কোর করেছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন যোগ্যতায় দরকার ৬৬'র ওপরে স্কোর। বাংলাদেশ সেখানে পেয়েছে ৭৩.২ স্কোর।

শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাকশিল্প, ঔষধশিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচকে ঊর্ধ্বমুখী অবস্থান। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ মেগা উন্নয়নের সাক্ষ্য বহন করে। গত ৫ দশকে বাংলাদেশের যেসব অর্জন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত করেছে তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়া, তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উঠে আসা, শান্তিরক্ষা মিশনে ব্যাপক অংশগ্রহণ ইতিবাচক ইমেজ তৈরি হয়েছে। জঙ্গিবাদ দমনে প্রশংসা কুড়িয়েছে বিশ্বের। এসময়ে দেশে কৃষি-শিল্পের উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বেড়েছে। অবকাঠামো উন্নয়নও হয়েছে। কৃষি খাতে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের কোটি শ্রমিক কর্মরত আছেন। একসময় কৃষি খাত অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখলেও আশির দশক থেকে ভূমিকা রাখতে শুরু করে পোশাকশিল্প খাত। পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অবস্থানে। এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। আর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০%-এর ওপর নারী। একটি দেশকে এগিয়ে নিতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। এ গুরুত্ব বিবেচনায় শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু রয়েছে উপবৃত্তির ব্যবস্থা। বর্তমানে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে সরকার। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়নভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকে। পোশাকশিল্পের মতো প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ঔষুধ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্যশিল্পের। শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। দেশে মানুষের গড় আয়ু বর্তমানে ৭৩.৬ বছর, যেখানে ভারতে ৬৮, পাকিস্তানে ৬৬ বছর। সামাজিক নিরাপত্তা খাতেও ব্যাপক হারে অগ্রগতি হয়েছে। হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতা হার এবং এর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু জাতিকে দেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শেখ হাসিনার হাত ধরেই দেশ এগিয়ে চলছে দুর্বার গতিতে। শেখ হাসিনার বড়ো কৃতিত্ব হলো, তাঁর নেতৃত্বে দেশের প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। নারী-পুরুষ একইসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের অগ্রগতিতে কাজ করছে। এই তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র ৫৩তম অবস্থানে রয়েছে। গত কয়েক দশকে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে বাংলাদেশ বেশ এগিয়েছে। মাত্র এক যুগের ব্যবধানে ৪১ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। আমাদের প্রত্যাশা দেশে সমৃদ্ধি, কল্যাণ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির চলমান গতি অব্যাহত থাকলে বিশ্বে সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ আরও ইতিবাচক অবস্থানে পৌঁছাবে। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা।

ফারিহা হোসেন: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং বায়োকেমেস্ট্রি ও পরিবেশ বিজ্ঞানে অধ্যয়নরত

দুর্নীতিকে না বলুন

দুর্নীতিকে না বলি
সুস্থ সমাজ গড়ে তুলি

চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস

সুস্মিতা চৌধুরী

চলচ্চিত্র হচ্ছে বিনোদনের মাধ্যম, দেশের সম্পদ এবং একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর মাধ্যমে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটিয়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। চলচ্চিত্র যোগাযোগেরও অন্যতম মাধ্যম। গতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ, সামাজিকীকরণ, নীতি-নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা, মানুষকে উজ্জীবিত করা, সত্য-সুন্দর প্রকাশে চলচ্চিত্রের অবদান অসামান্য।

জাতির পিতা মহান নেতা 'রাজনীতির কবি' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ছিলেন অম্লান নক্ষত্র। তাঁর বিচ্ছুরিত আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে– মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব ও রাষ্ট্রপতিত্বকালে অঙ্কুরিত হয়েছে নতুন, চলমান ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র সংস্কৃতি কাঠামো। এরই অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে বিল পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা সংক্ষেপে বিএফডিসি নামে খ্যাত)। এর ফলে দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়। এগিয়ে চলে ঢাকাভিত্তিক চলচ্চিত্রের জগৎ। নির্মিত হয় প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ*। সেসময় বাংলা চলচ্চিত্র পেয়েছে জহির রায়হান, সুভাষ দত্ত ও খান আতাসহ অনেক গুণী চলচ্চিত্রকার এবং আব্দুল জব্বার খান, রাজ্জাক, ফারুক, সৈয়দ হাসান ইমাম, কবরী, ববিতা, শাবানার মতো বহু মেধাবী শিল্পীদের।

> 'এই বাংলাদেশকে আমি বড়ই ভালোবাসি। তোদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, যদি পারিস– এই সোনার বাংলাদেশকে নিয়ে ছবি তৈরি করিস'– ১৯৭৩ সালে চলচ্চিত্রকর্মীদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে উৎকর্ষতার যুগ শুরু হয়। এসময়ে মুক্তিযুদ্ধ ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়। এছাড়া চলচ্চিত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক উৎসব ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা চলচ্চিত্রের অংশগ্রহণ শুরু হয়। বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলে চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পরিচালকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র উৎসব, মেলা-প্রদর্শনী, সভা-সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতায় চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র প্রেরণ করা হয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত সেন্সর আইন ও বিধি সংশোধন করা হয়। অসুস্থ শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ তহবিল' গঠন করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর আমলে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নবতম সংযোজন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এ প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ১৯৭২ সালে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাহিনিচিত্র নির্মাণ। এসবের মধ্যে রয়েছে– *ওরা ১১ জন*, *অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী*, *ধীরে বহে মেঘনা*, *আবার তোরা মানুষ হ*, *আলোর মিছিল* ও *সংগ্রাম*। উল্লেখ্য, *সংগ্রাম* ছবিতে অভিনয় করেছিলেন বঙ্গবন্ধু নিজে। বঙ্গবন্ধুর আমলেই নির্মিত হয় কালজয়ী উপন্যাসভিত্তিক চলচ্চিত্র *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৭৩)। এছাড়া ইতিহাসভিত্তিক চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে– *লালন ফকির* (১৯৭২), *ঈশা খাঁ* (১৯৭৪)।

বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণার ছাপ রয়েছে তাঁর সময়ে নির্মিত তরুণ চলচ্চিত্রকারদের চলচ্চিত্রে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এহতেশামের *এদেশ তোমার আমার*, মহীউদ্দিনের *মাটির পাহাড়*, ফতেহ লোহানীর *আকাশ আর মাটি*, সালাউদ্দিনের *যে নদী মরুপথে*, *সূর্যস্নান*, *ধারাপাত*, জহির রায়হানের *কখনো আসেনি*, *কাঁচের দেয়াল*, *বেহুলা*। সুভাষ দত্তের *সুতরাং* প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র হিসেবে জার্মানির ফ্রাংকফুর্টে অনুষ্ঠিত এশিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার পায়। জহির রায়হান রঙিন ছবি *সংগম* বানিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। অন্যদিকে উর্দু ভাষার চলচ্চিত্রের প্রচণ্ড আধিপত্যের মধ্যেও সালাউদ্দিন লোকগাথাভিত্তিক *রূপবান* (১৯৬৫) বানিয়ে বাংলা ভাষার চলচ্চিত্রে অন্য মাত্রা যোগ করেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) চলচ্চিত্র খাতে বরাদ্দ হয়েছিল ৪ কোটি ১০ হাজার টাকা। বরাদ্দকৃত এ অর্থে ফিল্ম স্টুডিওর সম্প্রসারণ, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন ফিল্ম স্টুডিও প্রতিষ্ঠা, ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও সারা দেশে ১০০টি নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়, এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হবে ছয় হাজার লোকের কর্মসংস্থান।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্রে গতি পায়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে ১৪ থেকে ১৫টি চলচ্চিত্র সংসদ গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিকভাবে এ দেশের নির্মাতা-কলাকুশলীদের পরিচয় করিয়ে দিতে এবং বাইরের

চলচ্চিত্রকে এ দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে ঢাকায় পোল্যান্ড চলচ্চিত্র উৎসব, ১৯৭৪ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে বিদেশে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রতিনিধিত্ব করে। একইসঙ্গে পুরস্কারও পায়। ১৯৭২ সালের তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে জহির রায়হানের *স্টপ জেনোসাইড* পুরস্কার পায়। এটি পরে সিডালক পুরস্কারও অর্জন করে। ১৯৭৩ সালে সুভাষ দত্তের অরুণোদয়ের *অগ্নিসাক্ষী* মস্কো, ১৯৭৪ সালে খান আতাউর রহমানের *আবার তোরা মানুষ হ* ও মিতার *আলোর মিছিল* তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ সময়কাল বিধৃত হয়েছে দেশি-বিদেশি মুভি ক্যামেরায়। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, প্রতিবাদ, জনসভা, সংবর্ধনা, অসহযোগ আন্দোলন, সাক্ষাৎকার, ৭ই মার্চের ভাষণ চলচ্চিত্রের উপাদান হয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রদর্শন হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রে এসব ব্যবহার হয়েছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে– দেশে আগমন, দিল্লি থেকে শুরু করে জাপান, রাশিয়া, মিসরে আগমন, ইরাকে বঙ্গবন্ধুর সফর নিয়ে একাধিক প্রামাণ্যচিত্র রয়েছে যেমন– *অসমাপ্ত মহাকাব্য*, *চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু*, *স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো* (৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ অবলম্বনে), *বঙ্গবন্ধু ফরএভার ইন আওয়ার হার্টস*, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* (বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্ব স্বীকৃতি বিষয়ক তথ্যচিত্র), *আমাদের বঙ্গবন্ধু* (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনভিত্তিক একটি প্রামাণ্যচিত্র), *সোনালী দিনগুলো* (বঙ্গবন্ধু সরকারের সাড়ে তিন বছর), *ওদের ক্ষমা নেই* ও *হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু*। এছাড়া উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে– *রহমান*, *দ্য ফাদার অব বেঙ্গল*, *বাংলাদেশ*, *ডেভিড ফ্রস্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ*, *দ্য স্পিচ*, *পলাশি থেকে ধানমন্ডি*, *বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ*।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ পরিচালনা ও নেতৃত্বের পেছনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন। কিন্তু শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি চলচ্চিত্র উপভোগ করতেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শক সমিতির অন্যতম সংগঠক মিয়া আলাউদ্দিন জানিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু *রূপবান* ছবিটি দেখেছেন। এছাড়া চিত্রগ্রাহক মাসুদ উর রহমান বলেছেন, *নবাব সিরাজউদ্দৌলা* ছবিও দেখেছেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে শুধু এ দেশের নির্মাতাদের সম্পর্ক ছিল না। অন্যান্য দেশের নির্মাতাদের সঙ্গেও তাঁর দারুণ সম্পর্ক ছিল। এদের মধ্যে রয়েছেন কিংবদন্তি ভারতীয় নির্মাতা সত্যজিৎ রায় ও জাপানের নির্মাতা নাগিসা ওসিমা।

দেশি চলচ্চিত্রের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর আমলে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে উর্দু ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা হয়। একই সময়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আমদানিকৃত উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার চলচ্চিত্র এ দেশীয় আমদানিকারক ও পরিবেশকরা বাংলাদেশের সম্পত্তি হিসেবে প্রদর্শনের অনুমতি চাইলে বঙ্গবন্ধু তাদের সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রপ্তানি শুরু হয়। বিভিন্ন ছবি রপ্তানি বাবদ ১৯৭২-১৯৭৩ অর্থবছরে দুই হাজার, ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে ১১ হাজার ও ১৯৭৪-১৯৭৫ অর্থবছরে পাঁচ হাজার ডলার আয় করতে সক্ষম হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সময়কালে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত সেন্সর আইন ও বিধি সংশোধন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সিনেমাটোগ্রাম রুলস ১৯৭২, দ্য সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট ১৯৬৩।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে প্রথমবারের মতো নির্মিত হতে যাচ্ছে তাঁর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এটি নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতীয় নির্মাতা শ্যাম বেনেগালকে। চলচ্চিত্রটির নাম *মুজিব: একটি জাতির রূপকার*। বিশাল বাজেট ও বড়ো আয়োজনে নির্মিত হচ্ছে চলচ্চিত্রটি।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে ২০১২ সাল থেকে সরকারিভাবে ৩রা এপ্রিল 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ বছর ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর দিনটি পড়েছে রমজানের মধ্যে। তারপরও নানান আয়োজনে দিনটি পালিত হয়েছে। এদিন সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে উৎসবের উদ্‌বোধন করা হয়। এরপর বিএফডিসির প্রশাসনিক ভবনের সামনে আনন্দ র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিএফডিসির ভিআইপি প্রজেকশন হলে এ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন বিএফডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুজহাত ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন পিএএ। এ বছর বিএফডিসিতে স্মরণিকা প্রকাশ, লাইভ টকশো, লালগালিচা সংবর্ধনা, মেলা, স্থিরচিত্র প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, বায়োস্কোপ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি, পরিচালক সমিতি, শিল্পী সমিতিসহ ঢাকাই সিনেমার সব সংগঠন মিলে একসঙ্গে উদ্‌যাপন করে দিবসটি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিও দিবসটি উদ্‌যাপন করে।

সুস্মিতা চৌধুরী: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

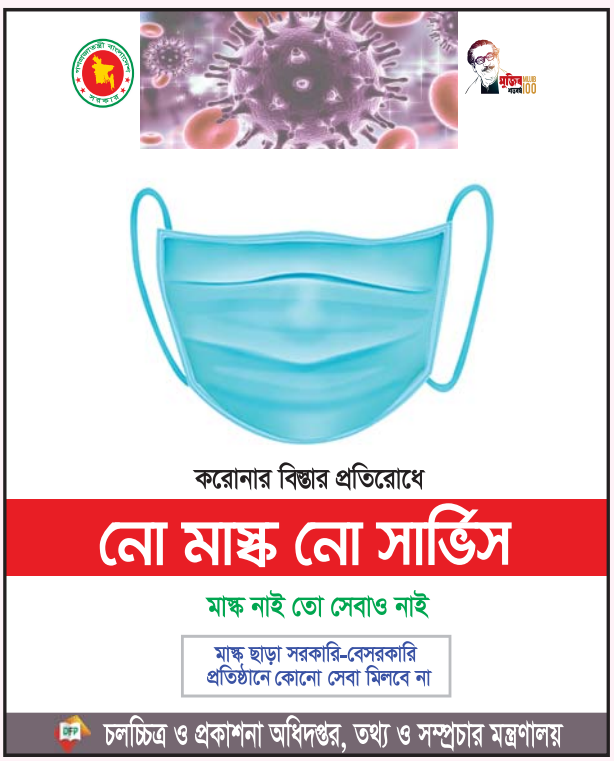

পুরুষেরও পর্দা করতে হবে

জেসমিন বন্যা

পর্দার কথা উঠলেই মেয়েদের পর্দার কথা মনে হয়। পর্দা প্রথার গুরুত্ব নিয়ে বেশ আলোচনা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু মেয়েদের পর্দা করা। কিন্তু সবাই ভুলে যান বা মনে করতে চান না যে ইসলামে পুরুষের পর্দার কথাও বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র *কোরানে* সূরা আন-নূর-এর ৩০ নম্বর আয়াতে নারীদের পর্দা প্রথার আগে পুরুষের পর্দার কথা বলেছেন, পুরুষের চোখ/নজর হেফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে, '(হে নবী); মুমিন পুরুষদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে, এবং পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটাই তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তৎ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।'

ইসলাম মতে পুরুষের চোখ শুধু তার নিজের স্ত্রীর সৌন্দর্য দর্শন করার অনুমতি পায়। বুরায়দা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) একবার হজরত আলীকে (রা.) বলেন, 'হে আলী, তুমি দৃষ্টির পর দৃষ্টি ফেল না। হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে যে দৃষ্টি পড়ে তার জন্য তুমি ক্ষমা পাবে। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়।' (আহমাদ, *তিরমিযী*, আবু দাউদ, দারেমী, *মিশকাত*, ৩১১০)। সমাজে যেভাবে মেয়েদের পর্দা করাটা শিক্ষা দেয়, ছেলেদের পর্দাকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ধর্মীয় দৃষ্টিতে পর্দা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য।

মানুষ পোশাক পরবে। আবহাওয়া অনুযায়ী পোশাক পরবে। যে পোশাক আরামদায়ক ও শালীনতা বজায় রাখে সে পোশাক নিয়ে কোনো কথা ওঠার কথা না। কিন্তু পোশাক শুধু মেয়ে নয়, ছেলেদের জন্যও প্রযোজ্য। যেমন: ছেলেরা লম্বা চুল রাখবে, আটসাট পোশাক পরে শরীর প্রদর্শন করবে ইসলাম তা অনুমোদন করে না। ইসলাম ধর্মীয় নির্দেশনা হিসেবে পর্দা ছেলে-মেয়ে উভয়েরই তা পালন করা উচিত।

পরিবার থেকে শুরু করে আমাদের সমাজব্যবস্থার ধ্যান-ধারণাও মেয়েদের ব্যাপারে নেতিবাচকভাবে গড়ে উঠছে। ধরা যাক, পরিবারের কন্যা সন্তানটি একটু জেদি, আদরের সুরেই বলা হবে– 'মেয়েদের এত জেদি হতে নেই মা।' আর ছেলেদের বেলায়! তখন বক্তব্য– 'ছেলেদের জেদ না থাকলে মানায় না।' ছেলে-মেয়ের কাজও ভাগ করা, এমনকি খেলনাও আলাদা। সবক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এটা বুঝিয়ে দেওয়া 'তুমি মেয়ে, তুমি মানুষ থেকে একটু কম, অসম্পূর্ণ।' এবং অন্য কেউ মানুক আর না মানুক তোমাকে মানতেই হবে তুমি যে নারী।

নারী সমাজের যত বড়ো আসনেই থাকুক, তার অবস্থান তার বরের উপর নির্ভরশীল। বরের চাকরি, পারিবারিক স্ট্যাটাসই নারীর স্ট্যাটাস। শ্বশুরবাড়িতে নিজের অবস্থান তৈরি করতে না পারলে জীবনের কোনো মানে নেই। অনেক অন্যায় হলেও বলবে 'শ্বশুরবাড়িতে তো একটু অত্যাচার সইতেই হবে।' বিপরীতে ছেলেকে শিখানো হয় শক্ত হওয়ার জন্য, 'শ্বশুরবাড়িতে গলে পড়িস না।'

অনেকেই হয়ত বলবেন, 'আমার পরিবার ব্যতিক্রম'। আমি বা আমার অনেক বন্ধু স্বাধীন। আমার বর আমাকে সাহায্য করে। ধরুন, আমাকে ছেলে-মেয়েকে খাওয়াতে, ঘরের কাজে, রান্নার কাজে সাহায্য করছে। আমার মতামতের গুরুত্ব দিচ্ছে। বাড়ির লোক, পাড়াপড়শিদের কেউ কেউতো আমার বরকে অপবাদ দিচ্ছে। অন্যদিকে, একই বৈশিষ্ট্যের জন্য আবার কেউ কেউতো তাকে ফেরেশতাও বলে ফেলেছেন। সংসার জীবনে এই সামান্য সহযোগিতায় পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মানব খ্যাতি অর্জনটা একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। সংসার দুজনের। কাজ ভাগাভাগি করে করলে পৃথিবীটা অশুদ্ধ হওয়ার কথা না। পরিবারে ছেলে-মেয়ে যে যে কাজে আগ্রহী তাকে তাই দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা হলো পরিবারে ছেলে-মেয়ের কাজ আলাদা করে শিখানো হয়। মূলত সন্তান লালনপালন করার দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী দুজনের।

একটু মনে করিয়ে দেই, একসময়ে বার বার মেয়ে সন্তান জন্মালে পুরুষরা দ্বিতীয় বিয়ে করত, ছেলের বাবা হওয়ার জন্য। আজ আমরা জানি সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়ার জন্য নারী দায়ী নয়, পুরুষ দায়ী। তাহলে এখন, 'ছেলের মা হতে পারবো না তাই তোমার ঘর করছি না–' এটা বলে কোনো নারী যদি সংসার সম্পর্ক ভেঙে দেয়, তাহলে কিন্তু রি রি পড়ে যাবে। যত ধরনের কালিমা লেপন মেয়ের কপালে জুটবে।

অনেক সময়ই বলতে শুনি, 'ভাই, আমার ছেলেটা না একেবারে স্ত্রৈণ, বউ ছাড়া কিছু বোঝে না।' এমনটা ভাবা উচিত না, হওয়াও উচিত না। বউ মানে প্রতিপক্ষ না। বউ ভালো পরামর্শ দিতে পারে। সংসারে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। খারাপ যে, সে সবসময়ই খারাপ, সেটা ব্যতিক্রম। বধূকে তার যোগ্য মর্যাদা প্রদান করতে হবে। সবাইকে যোগ্য সম্মান দিতে হবে। যার যে জায়গা সেটা দিতে হবে। মাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিতে জানতে হবে। সন্তানকে শিখাতে হবে। সবার আগে প্রয়োজন সহানুভূতিশীল হওয়া। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস স্থাপন করা, হক আদায় করা। নারীকে অসম্পূর্ণ নয়, পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে পারলে, ধর্মীয় অনুশাসন আংশিক/একপেশে হয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করলে পর্দা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা পালটাবে। নারী-পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে। সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে। চলুন নিজেকে বদলাই। নিজের একপেশে সীমাবদ্ধ চিন্তাধারাকে বদলাই। তবেই সমাজ বদলাবে।

জেসমিন বন্যা: সহকারী অধ্যাপক, সাটুরিয়া সৈয়দ কালু শাহ কলেজ, মানিকগঞ্জ, আবৃত্তিশিল্পী, উপস্থাপক ও আবৃত্তি সংগঠন স্বনাধীতির সভাপতি

বাঙালির প্রাণের মেলা বৈশাখি মেলা

ইসমত আরা পলি

পহেলা বৈশাখ আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। নিজস্ব সংস্কৃতিকে উপলব্ধি এবং এর নিরন্তর চর্চা করা যে- কোনো জাতির জন্যই গৌরবের। এ গৌরব বাঙালি জাতিরও রয়েছে। হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আমাদের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বাঙালি। এই বাঙালি সংস্কৃতির চিরায়ত রূপ ফুটে ওঠে বাংলা নববর্ষের দিন। বাংলা নববর্ষ বাঙালির সমগ্র সত্তা, অস্তিত্ব ও অনুভবের সঙ্গে মিশে আছে। এটা বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জ্বল দিক।

বৈশাখি মেলার মাধ্যমে বাঙালিদের মধ্যে একটি মেলবন্ধনের সূতিকাগার রচিত হয়। সব ভেদাভেদ ভুলে বাঙালিরা তাদের প্রকৃত সংস্কৃতিকে লালন এবং ধারণ করার শপথে আগুয়ান হয়। এ মেলা যেমন দেশীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাঙালিকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। তাই তো বাঙালিকে বিশ্ববাসী স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে, নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক হিসেবে আজও সম্মান করে। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর থেকে হিজরি, চন্দ্রাসন ও ইংরেজি সৌরসনকে ভিত্তি করে বাংলা সন প্রবর্তিত হয়। নতুন সনটি প্রথমে ফসলি সন নামে পরিচিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে তা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিতি পায়। বাংলা নববর্ষ যেহেতু সম্রাট আকবরের সময় থেকে পালন করা হতো এবং সে সময় বাংলার কৃষকেরা চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূস্বামীদের খাজনা পরিশোধ করত, এ উপলক্ষে তখন মেলা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। পরবর্তী সময়ে বৈশাখ উপলক্ষে যে মেলার আয়োজন করা হতো, সে মেলাকে 'বৈশাখি মেলা' নামে নামকরণ করা হয়। বৈশাখি মেলার সূচনার সঠিক তারিখ নির্ধারিত করা না গেলেও এ মেলা যে বাংলা বঙ্গাব্দ পালনের সূচনা থেকেই সূচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকার খুব বেশি অবকাশ নাই।

বাংলা নববর্ষের মূল আকর্ষণ বৈশাখি মেলা। মূলত নতুন বছর বরণকে উৎসবমুখর করে তোলে এ মেলা। বৈশাখি মেলা মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা হিসেবে স্বীকৃত। এ মেলা অত্যন্ত আনন্দঘন হয়ে থাকে। উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য নানাবিধ আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনের মধ্যে স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্য, কারুপণ্য, লোকশিল্পজাত পণ্য, কুটিরশিল্পজাত সামগ্রী, সব রকম হস্তশিল্পজাত ও মৃৎশিল্পজাত সামগ্রী উপস্থিত করার রেওয়াজ রয়েছে। এছাড়া শিশু-কিশোরদের খেলনা, মেয়েদের সাজসজ্জার সামগ্রী এবং বিভিন্ন লোকজ খাদ্যদ্রব্য যেমন চিড়া, মুড়ি-মুড়কি, খই, বাতাসা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মিষ্টির বৈচিত্র্যময় খাবারের সমারোহ থাকে। মেলায় বিনোদনেরও ব্যবস্থা থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগায়ক ও লোকনর্তকদের উপস্থিত করা হয়। তারা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, গাজিরগানসহ বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীত, বাউল-মারফতি-মুর্শিদি-ভাটিয়ালি ইত্যাদি বিভিন্ন আঞ্চলিক গান পরিবেশন করেন। লাইলী-মজনু, ইউসুফ-জুলেখা, রাধা-কৃষ্ণ প্রভৃতি আখ্যানও উপস্থাপিত হয়। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, নাটক, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, সার্কাস ইত্যাদি বৈশাখি মেলার বিশেষ আকর্ষণ।

শিশু-কিশোরদের আকর্ষণের জন্য থাকে বায়োস্কোপ, পুতুলনাচ, নাগরদোলা। শহরাঞ্চলে নগর সংস্কৃতির আমেজে এখনো বৈশাখি মেলা বসে এবং এই মেলা বাঙালিদের কাছে এক অনাবিল আনন্দের মেলায় পরিণত হয়। বৈশাখি মেলা বাঙালির আনন্দঘন লোকায়ত সংস্কৃতির ধারক। বৈশাখ বরণ উপলক্ষে এবং বিনোদন দেওয়ার মানসে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৈশাখি মেলার প্রচলন আছে। তবে এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বৈশাখি মেলা বসছে এবং সেসব স্থান দেশবাসীর কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে।

বৈশাখি মেলার প্রচলন গ্রাম থেকে শুরু হলেও এর আয়োজন এবং এতে অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি এখন নাগরিক সমাজের মধ্যেই অধিকতর প্রবল। তাই বলে গ্রামীণ পরিমণ্ডল থেকে তা পুরোপুরি হারিয়ে গেছে, এমনটিও বলা যাবে না। তবে বৈশিষ্ট্যগতভাবে গ্রামীণ বৈশাখি মেলা এখন যতটা না লোকজ উৎসব, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বার নিয়ন্ত্রিত ব্যাবসায়িক উপলক্ষ। অবশ্য ইতিবাচকভাবে দেখলে এটাও বলা যায়, বৈশাখি মেলার সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যুক্ত হওয়ার ফলে এর জৌলুসই শুধু বাড়েনি, ক্রমশ এর ব্যাপ্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে। ধারণা করা চলে, তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের দৈনন্দিন গৃহস্থালির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এসব অর্থনৈতিক অনুষঙ্গের কারণেই হয়ত বৈশাখি মেলা দিনে দিনে আরও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে এবং সর্বজনীনতার আরও উচ্চতর মাত্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

হাজার বছরের বাঙালিত্বের নিদর্শন বৈশাখি মেলা। এ মেলায় বাঙালি খুঁজে পায় তাদের জাতিসত্তার উৎস। পহেলা বৈশাখে বৈশাখি মেলার আয়োজন ছাড়া যেন বাঙালিত্ব পূর্ণতাই পায় না। দিন, মাসের অপেক্ষা শেষে যখন বাঙালির দোরগোড়ায় পহেলা বৈশাখ এবং বৈশাখি মেলা উপস্থিত হয় তখন বাঙালির চেয়ে খুশি আর বুঝি কোনো জাতির থাকে না। সব অশুভ তৎপরতা কাটিয়ে বাঙালির বৈশাখি মেলা আরও লাখ বছর বেঁচে থাকুক তার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য নিয়ে।

ইসমত আরা পলি: লেখক ও শিক্ষক

অটিজম

অবহেলা নয়, চাই সচেতনতা

শায়লা আক্তার

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের এমন একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা যা শিশুর জন্মের দেড়বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়। এ ধরনের ব্যক্তিদের সাধারণত শারীরিক গঠনে কোনো সমস্যা বা ত্রুটি থাকে না এবং তাদের চেহারা ও অবয়ব অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মতোই হয়ে থাকে। তবে তারা পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে পারে না, যেমন–ভাষার ব্যবহার আয়ত্ব করতে না পারা, একই ধরনের বা সীমাবদ্ধ কিছু কাজ বা আচরণের পুনরাবৃত্তি, অতিরিক্ত চঞ্চলতা, একই রুটিনে চলার প্রচণ্ড প্রবণতা, অন্তর্মুখী হয়ে থাকা ইত্যাদি। ঠিক কী কারণে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুর জন্ম হয় বিজ্ঞানীরা তা পুরোপুরি নির্ণয় করতে আজও সক্ষম হয়নি। ধর্ম-বর্ণ-আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে যে-কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় চারগুণ বেশি। সাধারণত শিশুর বয়স ৩ বছর হবার আগেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮ মাস থেকে ৩৮ মাস বয়সের মধ্যেই) অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। অটিজমের সাধারণ লক্ষণসমূহ হলো– শিশুর ভাষা শিখতে সমস্যা, একবছর বয়সের মধ্যে 'দা দা', 'বা বা', 'বু বু' উচ্চারণ করতে না পারা, দুই বছর বয়সের মধ্যে অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ দিয়ে কথা না বলা, স্বাভাবিক আচরণ করতে না পারা, চোখে চোখ রেখে না তাকানো, আনন্দের বিষয়ে আনন্দ না পাওয়া, পছন্দের বিষয় কারো সাথে ভাগ করে না দেওয়া, নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেওয়া, পরিবেশ অনুযায়ী মুখ ভঙ্গি পরিবর্তন না করা, একই কাজ বার বার করা (হাত নাড়ানো, তালি দেওয়া) প্রভৃতি। অটিজমের সাথে একটি শিশুর অন্যান্য কিছু সমস্যা থাকতে পারে। যেমন–খিঁচুনি (মৃগী), অতিচঞ্চলতা (হাইপার অ্যাক্টিভিটি), স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, হাতের কাজ করতে জটিলতা, হজমের সমস্যা, দাঁতের সমস্যা ইত্যাদি।

বর্তমানে অটিজম নিয়ে বাংলাদেশ তথা বিশ্বজুড়ে নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। সবার মধ্যে বেড়েছে সচেতনতা। ২রা এপ্রিল বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক অটিজম সচেতনতা দিবস। প্রতিবছর জাতিসংঘের উদ্যোগে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে অটিজমের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও সমাজে তাদের কার্যকর একীভূতকরণের উদ্দেশ্যে। জাতিসংঘের সাথে সাথে বাংলাদেশেও এবছর 'এমন বিশ্ব গড়ি অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা বিকশিত করি'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হয় ১৫তম অটিজম সচেতনতা দিবস। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি উপলক্ষে পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমাজের বোঝা নয়। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানবসম্পদকে পরিণত করা সম্ভব।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, 'ইতোমধ্যে নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) সুরক্ষা ট্রাস্ট অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তির গ্রহভিত্তিক পরিচর্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার জন্য কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ৫৩টি জেলার ১৯০টি উপজেলার ৩৯০ জন মাতা-পিতা ও অভিভাবককে অনলাইন প্রশিক্ষণ দিয়েছে। একইসঙ্গে ৬০টি জেলার ১০৫টি উপজেলার ১১৫টি বিদ্যালয়ের ৪৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এটি চলমান প্রক্রিয়া। 'বলতে চাই' ও 'স্মার্ট অটিজম বার্তা', নামক দুটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। সহায়ক প্রযুক্ত হিসেবে 'বলতে চাই' অমৌখিক যোগাযোগ সহজীকরণ করবে। শিশুর অটিজম আছে সন্দেহ হলে সহজেই 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' অ্যাপ দ্বারা ঘরে বসেই অটিজম আছে কি না তা জানা যাবে। এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় এবছরই ১৪টি উপজেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে 'অটিজম ও এনডিডি সেবাকেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে'।

বর্তমান সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে 'স্নায়ুবিকাশগত প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩' পাস হয়েছে এবং তার ফলাফল হিসেবে নিউরোডেভেলপমেন্টাল সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে, অটিজম রিসোর্স সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। বেশিরভাগ বড়ো সরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে মিডিয়াতেও অটিজম বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অটিজম শব্দটি আগের থেকে অনেক বেশি পরিচিত হয়েছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপি (Early Intervention) সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২রা এপ্রিল ২০১০ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন। এ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। উক্ত কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শুরু থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৫,৮২,৯০৭ জন ও মোট প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ৭৯,৫৩,৭৫১টি। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি/শিশুদের এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৪০টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে জুন/২০২১ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৩,৬৫,৬৯৭ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ৮,৩৪,৩০৮টি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রতিবন্ধী মানুষের দোরগোড়ায় থেরাপি সেবাগুলো পৌঁছে দেওয়া এই ভ্রাম্যমান ভ্যান সার্ভিসের অন্যতম লক্ষ্য। Early Detection, Assessment। Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ১০৩টি কেন্দ্র থেকে অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু/ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ, ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি, অডিওমেট্রি, অপটোমেট্রি, সাইকো সোশ্যাল কাউন্সেলিং, গ্রুপ থেরাপির মাধ্যমে খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ, অভিভাবকদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত ২৩,৬৪৫টি সেবা অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

সকল শিশুকে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় আনয়ন করা বর্তমান সরকারের একটি অঙ্গীকার। এই সকল শিশুর মধ্যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা অন্যতম, যাদেরকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রয়োজন রয়েছে। অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ

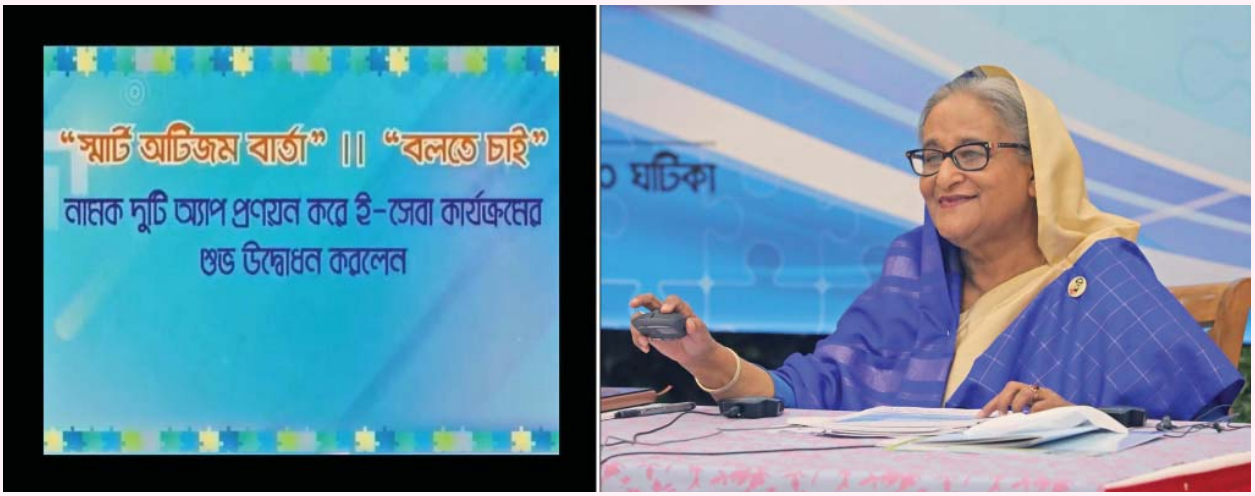

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল ২০২২ ঢাকায় গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রান্তে আয়োজিত ১৫তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' ও 'বলতে চাই' নামক দুটি অ্যাপের উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

মন্ত্রণালয় ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় ৬২টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এর আওতায় সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। ২০০৯ সালের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালাটি আরও যুগোপযোগী করে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১১ সালে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম স্কুল চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) এবং গাইবান্ধা জেলায় ১টিসহ মোট ১১টি অটিজম স্পেশাল স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কুলগুলোতে অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালার, ম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলাধুলা, সাধারণ জ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে– যা ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের নেতৃত্বে বাংলাদেশে অটিজম আন্দোলনের ফলে অনেক অটিস্টিক শিশু মূলধারায় ফিরে আসছে। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল ২০০৮ থেকে শিশুদের অটিজম ও স্নায়ুবিক জটিলতা সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কাজ শুরু করেন। এছাড়া বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। অটিজম বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত সায়মা ওয়াজেদ পুতুল অল্প সময়ের মধ্যেই নিজের কাজের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে প্রশংসা পেয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪-এর সেপ্টেম্বরে তাঁকে 'হু অ্যাক্সিলেন্স' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে। তাঁর উদ্যোগে ২০১১ সালে ঢাকায় প্রথমবারের মতো অটিজম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গঠিত হয় 'South Asian Autism Network (SAAN)' যার সদর দপ্তর করা হয় বাংলাদেশে। তাঁর চেষ্টাতেই বাংলাদেশে 'নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবিলিটি ট্রাস্ট অ্যাক্ট ২০১৩' পাস করা হয়। বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সৃষ্টিশীল নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায়ও স্থান করে নিয়েছেন তিনি। অটিজম ও নিউরোডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ পুতুল কখনও সরাসরি, কখনও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সব জাতীয় কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে দেশে অটিজম সংক্রান্ত বেশকিছু চিকিৎসা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যেমন–ইনস্টিটিউট ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (IPNA), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, প্রয়াস বিশেষায়িত স্কুল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশুরোগ বা মনোরোগবিদ্যা বিভাগ, নিকটস্থ জেলা সদর হাসপাতাল বা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিশেষায়িত স্কুল, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। সায়মা ওয়াজেদ পুতুল সরকারের সমর্থনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (সিএনএসি) নামে একটি কেন্দ্র চালু করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০-এ সিএনএসি (CNAC)-এর উদ্‌বোধন করেন। অটিজমে আক্রান্ত বাক্-প্রতিবন্ধীদের যোগাযোগের জন্য একটি ডিজিটাল সমাধান 'বলতে চাই' অ্যাপ। এতে রয়েছে উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তি যা শিশুর বিকাশ পরিলক্ষণ এবং সামগ্রিক সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অ্যাপটি বর্তমানে গুগল প্লে-স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। গুগল প্লে-স্টোর লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aims.boltechai. বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০২০ সালের মার্চ মাসে 'অটিজম-এর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে কী করবেন' নামে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করে।

বিশ্বে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে অটিস্টিক শিশুদের মধ্য থেকে তৈরি হয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের শিশুরা সে পথেই হাঁটছে। অটিজমের শিকার একজন মানুষ আর দশজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে কোনোদিক দিয়ে কম নয়। তাদের দরকার শুধু একটি সহমর্মিতায় ভরা পরিবেশ, শেখার সুযোগ আর তাদের প্রতি সমতাপূর্ণ দৃষ্টি– এটুকু দিতে পারলেই এই মানুষগুলো সমাজের সবাইকে সাথে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শায়লা আক্তার: প্রাবন্ধিক

চারুকলার প্রত্যাবর্তন

আজমেরী সুলতানা

'শিল্প' শিল্পীর অনুভূতি ও কল্পনা বহিঃপ্রকাশের একটি মাধ্যম, যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তার সৃষ্টিশীলতা, সৃজনশীলতা ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ এমন একটি স্থান, যেখানে অসাধারণ সম্ভাবনাময় তরুণ শিল্পীরা প্রতিনিয়তই তাদের সৃজনশীলতায় নান্দনিক সব শিল্পকর্ম তৈরি করে চলেছেন।

পরিবর্তনশীল এই যুগে শিল্প ক্ষেত্রের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। বর্তমান যুগ যেহেতু প্রযুক্তি নির্ভরশীল, শিল্প মাধ্যমেও প্রযুক্তির ব্যবহার করছেন তরুণ শিল্পীরা। 'প্রত্যাবর্তন'-এর শিল্পীরাও শিল্পকর্মের মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল মাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন, যার দরুন প্রদর্শনীর বেশির ভাগ অংশজুড়েই ছিল ডিজিটাল আর্ট।

শিল্পের এই উদীয়মান মাধ্যম অনুসরণ করে বাংলাদেশের লোকশিল্পকে নতুনরূপে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন শিল্পী রাসেল রানা। তার 'মাটির মানুষ' শিরোনামের শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে শিল্পী বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প 'টেপা পুতুল' ব্যবহার করেছেন, যা শুধু শিল্পীর সৃজনশীলতা ও কাল্পনিক ভাবনাই ব্যক্ত করে না বরং তার শিল্পে বাংলার সামাজিকচিত্র ও লোকশিল্পের নান্দনিক দিকগুলোও প্রকাশ পায়।

বাংলার লোকশিল্প বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির বাহক। শিল্পী ইমরান হোসেনের 'টেপা পুতুল'-এর ইলাস্ট্রেশনে বিখ্যাত কিছু ইউরোপীয় শিল্পকর্মের প্রতিকৃতিতে বাংলার লোকশিল্প 'টেপা পুতুল' ব্যবহার করেছেন। যাতে আমাদের লোকশিল্প নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় লোকশিল্পের একটি 'রিকশাচিত্র'। শিল্পী সৈকত চৌধুরীর 'দাদা চৌধুরী' শিরোনামের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পী রিকশাচিত্রকে শুধু রিকশাতেই সীমাবদ্ধ না রেখে তা আধুনিক যানবাহনে উপস্থাপন করেছেন যাতে আধুনিকতার পাশাপাশি লোকশিল্পের ছোঁয়াও বিদ্যমান।

কোনো মানুষের অতিরঞ্জিত প্রতিকৃতি হলো 'ক্যারিকেচার'। ক্যারিকেচারের মূল উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি বা বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য বা খুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ করা। শিল্পী শাহাদাত হোসেন সানি সেক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যমে তার দক্ষতার পরিচয় দেওয়ারই চেষ্টা করেছেন।

সাইবর্গ শিল্পকর্মে একজন কাল্পনিক ব্যক্তি যার শারীরিক সক্ষমতা যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। যদি বাস্তবেও সাইবর্গ থাকত, তবে কেমন দেখতে হতো সেই মানুষ, তার কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যায় শিল্পী মো. ইসরাত আবু তৈমুরের 'সাইবর্গ' শিরোনামের শিল্পকর্ম থেকে।

শিল্পী রবিউল আওয়াল রনি ডিজিটাল মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত 'ত্রিমাত্রিক মডেলিং' শিল্পকর্ম দ্বারা বেশ কিছু বস্তুনিষ্ঠ মডেল উপস্থাপিত করেছেন, যা শিল্পকর্ম প্রদর্শনীটিতে অন্য এক ধরনের নতুনত্ব নিয়ে এসেছে।

ডিজিটাল আর্টের অন্তর্ভুক্ত নতুন একটি মাধ্যমে আলোকচিত্র 'প্রত্যাবর্তন'-এ শিল্পী এস এম রাহিম, টিসু দেব ও সংগ্রামী মোহন উচ্ছ্বাস তাদের আলোকচিত্রের শিল্পকর্মগুলোতে প্রকৃতির সৌন্দর্যের অনন্য নিদর্শন তুলে ধরেছেন।

প্রদর্শনীতে প্রচলিত মাধ্যমের শিল্পকর্ম তৈরি করে অন্যান্য শিল্পীরা নিজেদের স্থান বজায় রেখেছেন। তবে লোকশিল্পের বিষয়বস্তু বরাবরই ছিল শিল্পীদের প্রধান আকর্ষণ।

'সাদা-কালো' শিরোনামের শিল্পকর্মটি বাংলার লোকশিল্পের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। শিল্পী ফুয়াদ হাসান কালো পৃষ্ঠতলে সাদা কলমে তৈরি শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হিসেবে লোকশিল্প ব্যবহার করলেও, তাতে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজস্ব আবেদন। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য ও জনজীবনের আনুষঙ্গিক উপাদানগুলো ব্যবহার করে বাংলাদেশের লোকশিল্পে উদ্ভাবনীয় এক শিল্পকর্ম সৃষ্টি করেছেন।

বাংলাদেশের লোকশিল্পের ধারা বহন করেছেন আরেক শিল্পী শৈলী। পৃষ্ঠতল হিসেবে তিনি বাংলাদেশের লোকশিল্প পট এবং মাধ্যম হিসেবে ফেব্রিক পেইন্ট ব্যবহার করেছেন। শিল্পকর্মটিতে তিনি ঐতিহ্যবাহী পটচিত্রের বিষয়বস্তু ব্যবহার না করে প্রকৃতির ও ঋতু বৈচিত্র্যের এক অনন্য নিদর্শন প্রকাশের চেষ্টা করেছেন।

চারকোল মাধ্যমের কথা উল্লেখ করলে শিল্পী দেবজ্যোতি বর্মণের শিল্পকর্মের কথা উল্লেখ করতে হয়। শিল্পী তার শিল্পকর্মটিতে বিভিন্ন প্রাণীর বাস্তবসম্মত প্রতিকৃতি তৈরি করেছেন, যা প্রশংসনীয়।

পেন্সিল মাধ্যমের শিল্পকর্মগুলোতে এক আলাদা আবেদন সৃষ্টি করেছেন তরুণ শিল্পীরা। উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিকৃতি চিত্রের মধ্যে রয়েছে শিল্পী সজীব রায় ও তানভির মালেকের শিল্পকর্ম। এছাড়াও শিল্পী আমিনুল সৈকতের শিল্পকর্মও উল্লেখযোগ্য। কারুশিল্পের কাজ সকল প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করে তোলে সবসময়ই, 'প্রত্যাবর্তন'-এর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। শিল্পকর্মে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে শিল্পীরা কারুশিল্পকে নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রদর্শনীতে অ্যাক্রলিক, প্রিন্টমেকিং, রং পেন্সিলে আঁকা শিল্পকর্মগুলো বেশ চোখে পরার মতো ছিল। শিল্পীরা তাদের মনোভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশই যেন করেছেন।

'প্রত্যাবর্তন'-কে ঘিরে চারুকলায় এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। চারুকলায় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের আনাগোনা ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণকে প্রাণোচ্ছল করে তোলে। প্রদর্শনীতে শিক্ষকদের পদচারণা তরুণ শিল্পীদের নতুন শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে আরও উদ্বুদ্ধ করেছে।

বেশ সংকটময় সময় পেরিয়ে শিল্পীরা আবারও ফিরেছেন নতুন উদ্যমে তাদের নব্য চিন্তাধারার শিল্পকর্ম নিয়ে, যাতে 'প্রত্যাবর্তন' তাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। করোনাকালীন সময়টুকুকে যদি বর্তমান শিল্পচর্চার অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় ধরা হয়, তবে 'প্রত্যাবর্তন' যেন রেনেসাঁসের পুনরাবৃত্তি। সেই সঙ্গে দীর্ঘ এই কঠিন সময় পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহমান শতবর্ষপূর্তীতে চারুকলা অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত 'প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক শিল্পকর্ম প্রদর্শনীটি যেন দেশ এবং প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এক বিশেষ উপহার স্বরূপ।

আজমেরী সুলতানা: শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

একটি প্রাইমারি স্কুল

নাসিম সুলতানা

রাজু ভাবছে এবার ঈদে সে কোনো কিছু নেবে না। সে তার বাবাকে বলবে ঐ টাকা তাকে দিতে। কারণ স্কুলের জন্য কিছু ফুল গাছ কিনতে হবে।

টাঙ্গাইল জেলার বাংড়া গ্রামে তাদের বাড়ি। তার বাবারা দুভাই। বড়ো ভাই লেখাপড়া শিখে ঢাকায় চাকরি করেন। তিনি দুই ছেলে নিয়ে ঢাকায় থাকেন। আর তার বাবা ঠিকমতো লেখাপড়া না করায় তাদের দাদার ভিটায় তাদের সাথে থাকতে হলো। যা জমি-জায়গা আছে তা দিয়ে তাদের সংসার চলে যায়। রাজু তাদের একমাত্র ছেলে।

রাজুকে তাদের বড়ো চাচা ঢাকায় এনে পড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজুর মা বলেছিল, না ভাইজান, রাজু আমাদের কাছে থেকেই পড়ালেখা করুক। এরপর রাজুকে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিলো।

প্রতিবছর সে ভালো রেজাল্ট করেই ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে। ক্লাসে ভালো ছেলে হিসেবেও তার শিক্ষকদের কাছে সে খুব আদরের। এভাবে দিন যেতে যেতে সে এখন পঞ্চম শ্রেণিতে উঠেছে। এবার সে পিইসি পরীক্ষা দিবে। এই একটা বছরে তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঠিক করল স্কুলের ভেতরে যে এক খণ্ড খালি জায়গা আছে– যেখানে তাদের পিটি হয়, তার একপাশে একটু খালি জায়গা আছে সেখানে গাছ লাগাবে। রাজু ও তার বন্ধুরা মিলে স্কুল ছুটির পর ঐ জায়গাটি ভালো করে কুপিয়ে সেখানে তারা ফুল গাছ লাগালো। তারা নাশতা খাওয়ার টাকা দিয়ে কিছু ফুলগাছ কিনেছিল।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা এত সুন্দর একটা ছোট্ট বাগান দেখে রাজুর অনেক প্রশংসা করল।

রাজু বলল, স্যার, স্কুলের সৌন্দর্য রক্ষা করা ছাত্রদেরই কাজ। এটা গ্রামের প্রাইমারি স্কুল। ঢাকা শহরের বড়ো স্কুলগুলোতে তো বাগান দেখাশোনা করার জন্য মালি থাকে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে তো সেটা সম্ভব নয়। সুতরাং এটা ছাত্রদেরই করা উচিত। এই বাগানের গাছগুলো আমরা কয়েকজনে মিলে কিনেছি। আর কাউকে গাছ কেনার জন্য কোনো টাকা দিতে হবে না। আমার চাচা ঢাকা থেকে আমার জন্য ফুলের গাছ নিয়ে আসবে। এবার ঈদ তিনি দাদার সাথে করবেন।

রাজু ভাবছে গতবার ঈদে তার চাচাতো ভাই রবি এসেছিল তাদের সাথে ঈদ করতে। রবি একটি Tab এনেছিল। Tab হলো কম্পিউটারেরই একটি ছোটো ভার্সন, যার মধ্যে কম্পিউটারের যাবতীয় কাজ করা যায়। এতে সে তার স্কুলের ছবি দেখিয়েছিল। স্কুলটি খুব সুন্দর। একপাশে কী সুন্দর বাগান!

রাজু তখনই মনে মনে পরিকল্পনা করেছিল তাদের স্কুলেও সে একটি বাগান করবে। গতকাল ফোনে তার চাচা জিজ্ঞেস করেছিল– এবার ঈদে তুই কী নিবি ?

উত্তরে রাজু বলেছিল, চাচা, আমি এবার ঈদে কিছুই নিব না। আপনি আমাদের স্কুলের জন্য কয়েকটা ফুলের চারা ও মেহগনি গাছের চারা আনবেন। কথাটা শুনে রাজুর চাচা অনেক খুশি হয়েছিল। তিনি রাজুর জন্য শার্ট-প্যান্ট কিনলেন এবং বাড়ি আসার সময় গোলাপ, বেলি, জুঁই, চামেলি ফুলের চারা এবং কিছু মেহগনি গাছের চারা নিয়ে আসলেন।

পরদিন স্কুলে এগুলো প্রধান শিক্ষকের হাতে দিলেন এবং রাজুর সব কথা বললেন। শিক্ষকগণ রাজুর অনেক প্রশংসা করলেন। তারপর রাজুর বাগানটা ঘুরে দেখে তার চাচা তাকে অনেক আদর করলেন।

এর কিছুদিন পরের কথা। পঞ্চম শ্রেণির পিইসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। রাজুর হাতে এখন অনেক সময়। সে বাগানটা আরও সুন্দর করে ফেলল। যথাসময় তাদের রেজাল্ট বের হলো। রাজু A+ পেল। তাতে সবাই খুশি। স্কুলটি ভালো রেজাল্ট করার জন্য T.N.O সাহেব, ইন্সপেক্টর সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এসেছে। তারা স্কুলের রেজাল্ট ভালো দেখে খুব খুশি হলেন। আরও খুশি হলেন স্কুলের সামনে এত সুন্দর একটি বাগান দেখে। মেহগনি গাছগুলো স্কুলের কিনারা দিয়ে লাগানো হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক বললেন, রাজু নিজেদের টিফিনের পয়সা তারপর গতবার ঈদের পোশাকের টাকা ইত্যাদি জমিয়ে এ বাগানটায় গাছ লাগিয়েছে। এবার ওর চাচা ওহাব সাহেব ঐ ফুলগাছগুলো ও মেহগনি গাছগুলো এনে দিয়েছে।

সবকিছু দেখে T.N.O সাহেব ও ইন্সপেক্টর সাহেব খুব খুশি হলেন এবং রাজুকে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দিলেন এবং টাঙ্গাইল জেলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে রাজুর ফুল ফ্রি স্টুডেন্টশিপে পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

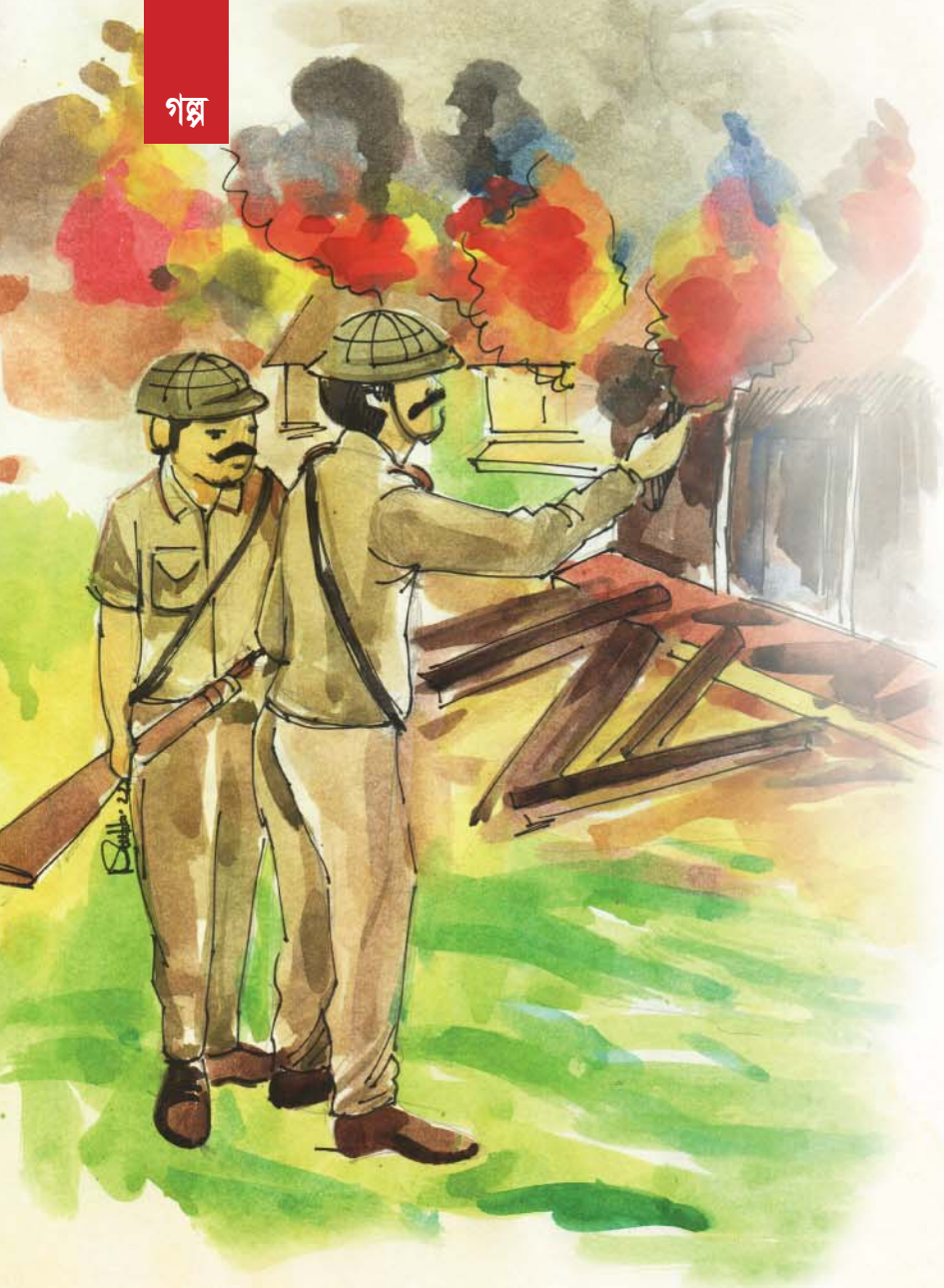

সমু পাগলা

জসীম আল ফাহিম

'হই-হই-হই। ওরে মানকচু! ওরে শাখামৃগ! দাঁড়াস না একবার। নাগালে পেলেই হলো– দেখাব মজা।'

বলেই লাঠি হাতে ছোটোদের দিকে তেড়ে যাবেন 'সমু পাগলা'। কিন্তু কাউকে ধরতে পারেন না। তার এভাবে তেড়ে যাওয়াটা ছোটোরা খুব উপভোগ করে। ওরা ভীষণ মজা পায়। তাড়া খেয়ে ওরা কিছুদূর দৌড়ে যায় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে এসে তাকে উত্যক্ত করে। রাগানোর চেষ্টা করে। কেউ ইটের টুকরো, নুড়ি, কাকর ছোড়ে। কেউ বা জামা ধরে টান মারে। কেউ আবার পাগলার গায়ে জল ঢেলে দেয়।

ছোটোদের এত উৎপাত কত সইবেন সমু পাগলা! ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে তিনি কিছুসময় কাঁদবেন। আর বলতে থাকবেন–

'আহ্ হা রে! আমার ছেলেটা আজ বেঁচে নেই রে। থাকলে কী তোরা আমাকে এত জ্বালাতন করতে পারতিস? পারতি না। সবই আমার কপালের লেখনী। কেন যে সে সময় ওদের সঙ্গে আমারও মরণ হলো না। মরণ হলেই বরং ভালো ছিল।'

এই সব আহাজারি করে সমু পাগলা সিরাজ বেপারি মজুতদারের দোকানের বারান্দায় গিয়ে বসবেন। বসে মজুতদারকে উদ্দেশ করে কিছুক্ষণ গালমন্দ করবেন। তার গালমন্দের ধরন অনেকটা এমন–

'তুই রাজাকার! তোর চৌদ্দগোষ্ঠী রাজাকার! তোর জন্যই আজ আমার এই দশা। তোর জন্যই আমার ছেলেকে হারিয়েছি। মেয়েটাকে হারিয়েছি। আমার বউকে হারিয়েছি। আমি তোকে কোনোদিন ক্ষমা করব না-রে সিরাজ বেপারি। কিছুতেই ক্ষমা করব না।'

বলে সমু পাগলা ডুকরে কেঁদে উঠবেন। তারপর কান্না থামিয়ে হঠাৎ দৌড় শুরু করবেন। বাজারের এ মাথা থেকে ও মাথায় দৌড়ে যাবেন। দেখে মনে হয় সমু পাগলা বুঝি কাউকে দৌড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাস্তবিক কিন্তু তা নয়। তিনি একাকীই দৌড়ে যান। কেন যে দৌড়ে যান কে জানে। বাজারের শেষ মাথায় গিয়ে বড়ো বটগাছটার তলে তিনি ঠাঁই দাঁড়াবেন। ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে থাকবেন। তার এমন ঘটনা বলা যায় প্রতিদিনই ঘটে। প্রতিদিনই তিনি এমন সব কাণ্ড করে বেড়ান।

তার এরূপ কাণ্ড করার পেছনে একটা গল্প আছে। গল্পটা কেউ জানে না। জানেন শুধু একজন– আবদুল করিম হাজি। অশীতিপর বৃদ্ধ করিম হাজি সমু পাগলার বাল্যবন্ধু।

সেদিন রাতে নাতি-নাতনিদের নিয়ে তিনি গল্প করতে বসলেন। ডিসেম্বর মাস। আকাশে ঝলমলে চাঁদ। চাঁদের আলোয় সবকিছু ভালোই দেখা যাচ্ছিল। করিম হাজি বাড়ির উঠোনে শীতলপাটি বিছিয়ে বসেছেন। শিরশির হিমেল বাতাস বইছে। রাতের আকাশে কয়েকটি কলাবাদুর ডানা মেলে উড়ে গেল।

করিম হাজি বললেন, 'আজ আমি তোদের একটা সত্যি ঘটনা শোনাব। শুনে তোদের কাছে গল্প বলেই মনে হবে। হলে হোক। কোনো সমস্যা নেই। তবু আমি ঘটনাটা তোদের শোনাতে চাই।'

দাদুর পাশে নাতি-নাতনি রতন, রত্না, শোভন, সোহাগ ও ফুলকলি উঠোনে বসে আছে।

রতন হঠাৎ বলে উঠল, 'আমরা তো রূপকথার গল্প শুনতে এসেছি দাদাভাই।'

করিম হাজি বললেন, 'রূপকথার গল্প আজ থাক। আজ না-হয় আমরা একটা সত্যিকারের গল্পই শুনি। কী বলিস তোরা!'

রত্না বলল, 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প নাকি দাদাভাই? মুক্তিযুদ্ধের গল্প হলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

রত্নার সাথে শোভন, সোহাগ, ফুলকলিও একমত পোষণ করল।

দাদাভাই বললেন, 'আমি তোদের মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের একটা ঘটনা শোনাতে চাই।'

রতন এবার ওদের সাথে সুর মিলিয়ে বলল, 'ঠিক আছে দাদাভাই। তাহলে ওটাই শোনাও।'

দাদাভাই বললেন, 'আচ্ছা! সমু পাগলাকে তো তোরা চিনিস। নাকি চিনিস না?'

সোহাগ বলল, 'চিনব না কেন। নিশ্চয়ই চিনি।'

শোভন বলল, 'স্কুল থেকে ফেরার পথে বাজারের ওপর দিয়ে ফিরতে গেলেই তার দেখা মেলে। হই হই করে লাঠি হাতে তেড়ে আসে। তখন দৌড় না দিলে নির্ঘাত লাঠিপেটা।'

রতন বলল, 'সেদিন সিরাজ বেপারিকে বাজার ভরা লোকের সামনে সমু পাগলা কী মারটাই না মারল! যদি তুমি একবার নিজের চোখে দেখতে দাদাভাই। আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে না ফিরালে বেপারির জীবনের বারোটাই বেজে যেত।'

শোভন ও রতনের কথা শুনে দাদাভাই জোরে একটা নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, মানুষটার এমন হওয়ার কথা ছিল না। সে ছিল আমার সহপাঠী। ছাত্রজীবনে খুবই মেধাবী ছিল। ক্লাসে সবসময় ওর রোল নম্বর থাকত 'এক'। পড়াশোনা শেষ করে সে ইপিআর-এ চাকরি নিয়েছিল। এরই মধ্যে সমু বিয়ে করল। ঘর-সংসার হলো। ঠিক তোদের মতো তারও একজোড়া ছেলেমেয়ে ছিল।

তখন ১৯৭১ সাল। ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনী ঢাকায় নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালাল। অপারেশন সার্চলাইট নামে তারা ইতিহাসের এক জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ চালাল। এতে নিহত হলো অনেক ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, দিনমজুরসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ।

সে রাতেই সমু ইপিআর-এর চাকরি ছেড়ে গ্রামে ফিরে এল। গ্রামে এসে গ্রামবাসীদের নিয়ে সে মুক্তিবাহিনী গঠন করল। সমু হলো সেই মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার। সমুর সঙ্গে আমিও সেদিন মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করলাম। আমরা পাকিস্তানি মিলিটারিদের বিরুদ্ধে ছোটো-বড়ো গেরিলা অপারেশন চালাতে লাগলাম। আমরা মিলিটারিদের রাতের ঘুম হারাম করে ছাড়লাম।

আমাদের এসব কাজে একদিন বাধ সাধতে এল মজুতদার সিরাজ বেপারি। বেপারি ছিল একজন খাস রাজাকার। পাকিস্তানি মিলিটারিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ না করতে সে আমাদের কড়াভাবে শাসিয়ে গেল। কিন্তু আমরা কী ওই মজুতদারের খাই না পড়ি যে ওর কথা শুনব? আমরা ওর কথায় কান দিলাম না। বরং বীরদর্পে মিলিটারিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলাম। দিনেরবেলা আমরা ক্যাম্পে শুয়ে বসে ঘুমাতাম। আর রাত নামলেই মিলিটারিদের ওপর আজাব হয়ে নাজেল হতাম। এভাবেই চলছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

সমু একদিন বলল, আমি ফুলপুর যাচ্ছি। ফুলপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি। আমার বউ-বাচ্চারা ওখানে থাকে। ওদের একপলক দেখার জন্য মনটা বড়ো আকুপাকু করছে। বেশি সময় নেবো না। ঘণ্টা দুয়েক। তারপরই ফিরে আসব।

সমু ফুলপুর গেল দুপুরবেলা। আর বিকেলবেলা আমরা খবর পেলাম–মিলিটারিরা সমুকে ধরে ফেলেছে। মিলিটারিরা আসলে ওকে ধরেনি। ধরেছিল রাজাকারেরাই। মজুতদার সিরাজ বেপারি এবং তার চেলারা। ওরা সমুকে নিয়ে একটা কাঁঠাল গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। তার বউ, ছেলেমেয়ে এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে একটা ঘরে বন্দি করে রাখল। তারপর ওরা লাঠি দিয়ে সমুকে ইচ্ছেমতো পেটাল।

সমুকে আটক করে ওরা মিলিটারি ক্যাম্পে খবর পাঠাল। খবর পেয়ে মিলিটারিরা জলপাই রঙের জিপে সাইরেন বাজাতে বাজাতে সমুর শ্বশুরবাড়িতে ছুটে এল। এসেই আর কোনো কথা নেই, সমুর চোখের সামনেই তার ছেলেমেয়ে, বউ এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে ওরা গুলি করে মারল। সমুকেও হয়ত ওরা মেরে ফেলত। কিন্তু ততক্ষণে আমরা মুক্তিবাহিনী ভাইয়েরা সশস্ত্র সেখানে পৌঁছে যাই। আমরা অতর্কিত মিলিটারিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। ওরা কোনো কিছু বুঝতে না বুঝতেই আমরা ওদের কয়েকজনকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম। বৃষ্টির মতো আমরা গুলি করতে লাগলাম। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজাকার এবং মিলিটারিরা পরাজিত শেয়ালের মতোই লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল।

আমরা আহত সমুকে উদ্ধার করে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে এলাম। ক্যাম্পে এনে সপ্তাহখানেক সেবা-শুশ্রূষা করার পর সমু সুস্থ হয়ে ওঠল। কিন্তু তার শরীরের ক্ষত সারলেও মনের ক্ষত আর সারল না। মাসখানেক পর হঠাৎ একদিন সে অচেতন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। যখন তার সংজ্ঞা ফিরল, তখন কেমন যেন আবোলতাবোল বকতে শুরু করল। ওর এরূপ বকাবকি শুনে আমরা ধরে নিলাম সমুর স্মৃতিশক্তি লোপ পয়েছে। সেই যে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেল, আজও সেই অবস্থাতেই আছে। প্রথম প্রথম আমি ছাড়া সে কাউকে চিনতে পারত না। পরে অবশ্য আস্তে আস্তে চিনেছে। তবে পাগলাটে ছাঁটটা এখনো তার রয়ে গেছে। বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসটা এলেই সমুর যেন কী হয়ে যায়। তার মাথা বিগড়ে যায়। পাগলামু ছাঁটটা এ সময়ই বেশি দেখা যায়।

এতটুকু বলে করিম হাজি একটু থামলেন। কোনো এক অজানা কারণে কাঁধের গামছা দিয়ে তিনি চোখ মুছলেন। দাদাভাইয়ের চোখের জল মোছার দৃশ্যটা নাতি-নাতনি কারও চোখ এড়াল না। সেসময় আকাশে চাঁদের মুখে হঠাৎ মেঘ জমতে দেখা গেল। কিছু একটা নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটে আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে উড়ে গেল।

রত্না হঠাৎ সরব হয়ে ওঠল। 'তারপর কী হলো দাদাভাই?'

দাদাভাই ধরা গলায় বললেন, 'তারপর! তারপর থেকেই সমুর জীবনে দিন গিয়ে রাত নামে। রাত গিয়ে ভোর হয়। আবারও নতুন দিন আসে পৃথিবীতে। কিন্তু সমুর আর কোনো পরিবর্তন হলো না। চিরদিনের মতো সে পাগল হয়েই রইল।'

দাদাভাইয়ের কথা শুনে সোহাগ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা দাদাভাই! সমু পাগলাকে খাওয়ায় কে? তিনি থাকেনই বা কোথায়?'

দাদাভাই বললেন, 'মাঝেমধ্যে সে আমার কাছে আসে। তখন আমিই ওকে খেতে দিই। আর থাকার কথা বলছিস–পাগল মানুষ! যেখানে রাত সেখানেই কাত। শোয়ার মতো একটু জায়গা পেলেই হলো। ঘুমিয়ে পড়বে।'

সেসময় হঠাৎ বাড়ির প্রধান ফটকে কিছু একটা ঠকঠক ধরনের আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটা শোনামাত্র দাদাভাই চট করে বসা থেকে উঠে পড়লেন। নাতি-নাতনিদের ফিসফিস করে বললেন, 'তোরা এখন ঘরে যা। সমু পাগলা এসে গেছে।'

আমি যে এই মাটির ছেলে

আসলাম সানী

বাল্মীকি-ভুসুকু আমি
কালিদাসের ছায়া
এই হৃদয়ে সংস্কৃত আর
বাংলা ভাষার মায়া–
মাইকেল-রবি-নজরুল-জীবনদাশ
আমার মেধা-চেতনা-প্রেম এই বুকে বসবাস
বিদ্যাসাগর-তর্কালঙ্কার-শরৎ-মানিকবাবু
আমার সকল-বোধ-বুদ্ধি করেছে হায়। কাবু–
আমি কালের স্রোতধারায়
সেই যে গেছি হারায়–
সেই যে আমার মননজুড়ে লেনিন এসে দাঁড়ায়
কার্লমাকস যে তাড়ায়
আমি কবে কখন– নেতাজী-শেখ মুজিবে যে
গেছিরে ভাই হারায়–
পদ্মা-মেঘনা-বঙ্গোপসাগর
আমার কণ্ঠস্বর
বাহান্নে অমর
মহান একাত্তর
এই যে আমার প্রাণে
পল্লিগীতি-ভাটিয়ালি-ভাওয়াইয়া সুর টানে
শচীনকর্তা-আব্বাসউদ্দীন-জসীমউদদীর গানে
এই আমাকে টানে–
আমি যে এই মাটির ছেলে
মাটিই ভালো জানে
আমার শ্রদ্ধা-সম্প্রীতি-সুখ
শান্তির সব মানে
এই প্রকৃতিই জানে ...।

বিশ্ববন্ধু বঙ্গবন্ধু

পারভীন আক্তার লাভলী

বঙ্গবন্ধু বিশ্ববন্ধু
সর্বজনে বলে
বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন
পরাধীন এক কালে।
ভিনদেশিদের শাসন-শোষণ
ভেঙে দেবার তরে
বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন
বাংলা মায়ের ঘরে।
অবাঙালির দুঃশাসনে
বঙ্গবন্ধুর উদার মনে ...
স্বাধীনতার স্বপ্ন বোনে
আপন মনের কোণে।
অসমতার স্বপ্নগুলো
সামনে তুলে ধরে
স্বাধীনতার অমর বাণী
জাগিয়ে দিলেন শিরে।
ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন
পর্বে পর্বে গেঁথে
বাঙালিকে তাগিদ দিলেন
লড়াই করে যেতে।
বঙ্গবন্ধু বিশ্ববন্ধু ...
গরিব-দুখির মিতা
বঙ্গবন্ধু নন্দিত এক
কিংবদন্তি নেতা
বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেলেন
অমূল্য ধন স্বাধীনতা।

বসে আছি প্রার্থিত বৈশাখের আশায়

কাজী সুফিয়া আখ্‌তার

ধুলো উড়িয়ে চলে যায় ঋতুরাজ বসন্ত
পাহাড়-নদী, জলে-স্থলে সময় নেই অনন্ত
শান্তিপ্রিয় মানুষ আছে দাঁড়িয়ে শত শত
নত মুখে চোখ বুজে মগ্ন সবাই প্রার্থনারত
উড়িয়ে নিয়ে যাও সব নিষ্ঠুর উদাসীনতা
উড়িয়ে নিয়ে যাও জগতের রুক্ষ প্রাণহীনতা।

আমরা বসে আছি শুভ পার্থিব আলোর আশায়
বৈশাখ আসবে অসাম্প্রদায়িকতার সেতুবন্ধনে
রমনার বটমূলে কবিতায়, পঞ্চ কবির গানে গানে,
ঢাক-ঢোল বাদ্যের প্রাণময় মঙ্গল শোভাযাত্রায়
নয় কোনো মানবতাবর্জিত সাম্প্রদায়িক হননে
উৎসব আমেজে নববর্ষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দের আবাহনে।

শুভ হালখাতা

এম ইব্রাহীম মিজি

পহেলা বৈশাখে হয় শুভ হালখাতা
বৈশাখি উৎসব নামে চিনে সবায় তা।
বাড়ি বাড়ি ঘরে ঘরে কত আয়োজন
চিড়া দই মুড়ি খায় আত্মীয়স্বজন।

গ্রাম্য জনপদে বসে বৈশাখি মেলা
হয় সেথায় চড়কি লাঠিয়াল খেলা।
কিশোর-কিশোরী কিনে চুড়ি আর পুতি
পাড়াময় ঘুরে বেড়ায় যুবক-যুবতী।

প্রেমিক-প্রেমিকা নেয় গোলাপের ঘ্রাণ
ভাটিয়ালি গান শুনে জুড়ায় পরান।
আকুলি-ব্যাকুলি করে বাঁশুরিয়া সুর
রাখাল বাজায় বাঁশি দূরে বহু দূর।

এসেছে বছর ঘুরে বর্ণালি বৈশাখ
মনের কালিমা যত যাক মুছে যাক।

রমজান এসেছে

আব্দুল আওয়াল রনী

রমজান এসেছে, রমজান এসেছে
রমজানের সকল নিয়ামত লয়ে
দেখো– তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।
আনন্দ-উৎসব মুখরিত চিত্তে,
নাও সবে সাদরে গৃহের ভিতরে।
করো না কোনো গড়িমসি ছলচাতুরী,
ঠকবে নিজেরাই ফিরিয়ে দিও না।
এই নিয়ামত হারালে আর তো পাবে না,
জীবন তো ক্ষণিকের– সকলের জানা,
স্রষ্টাই জানেন মানুষের নিয়তির ঠিকানা।
আস্‌লে ভবে, যেতে হবে–এই তো বিধিবিধান।
পবিত্র মাসে নিয়ম রক্ষা করে পালন করি রমজান।

পুণ্যময় রমজান

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

মাহে রমজান বরকতময়
বলেছে যে কুরআন,
মানলে সকল বিধিনিষেধ
তাজা হয় যে ঈমান।

রমজানেতে হয় যে নাজিল
পবিত্র কুরআন,
যার ভেতরে পূর্ণ আছে
জীবনেরই বিধান।

সকল ফরজ মুমিনগণের
রমজানে পায় পূর্ণতা,
ভরে উঠে কানায়-কানায়
যতই থাকুক শূন্যতা।

রমজানে মিলে শবেকদর
সহস্র মাসের সেরা,
জাকাত-ফিতরায় ধনী-নির্ধন
যেন মমতায় ঘেরা।

বৈশাখি লিমেরিক

আতিক রহমান

বৈশাখ আনে বাংলা নববর্ষের আবাহন
বৈশাখ এলে নব বছরে উদ্বেলিত মন।
বৈশাখি ঝড়ে কত আম পড়ে
বৈশাখি গান বাজে অন্তরে
বৈশাখ আনে বাংলা মাসের নতুন একটি সন।

এই রমনার বটতলে বসে বৈশাখি আয়োজন
পান্তাভাত আর ইলিশ খাবার জন্য আকুল মন
বৈশাখি মেলা বসে গাছতলা
বৈশাখ নিয়েই কত কথা বলা
গর্বে বাঙালি বুক ফুলিয়ে বেড়ায় সারাটি ক্ষণ।

বর্ষবরণ ১৪২৯ সাল

বেগম শামসুন নাহার

বসন্ত বাউরিরা উড়ে গেছে ঐ সুদূরে,
এসেছো তুমি চির নবীনের গাহিতে গান সুরে সুরে
হে বৈশাখ, তুমি কালবোশেখির তাণ্ডব
প্রচণ্ড তাপদাহে চৌচির মাঠ-ঘাট-প্রান্তর,
তুমি রমণীর বসনের লাল ফিতা আর রেশমি চুড়ির তাল
কিষানির তৃষ্ণার জল– মখমলি মাথাল।
বাংলার সুখ-ভরা ঐতিহ্যের গৌরবে
এসেছো রমনা বটমূলের বর্ষবরণ উৎসবে।
রাজপথে আঁকা অপরূপ আলপনায়-মঙ্গল শোভাযাত্রায়,
নৃত্য-গীতে, ফুল-পাখিদের সাথে মিঠাই-মণ্ডা
পান্তা ইলিশের ভরা আয়োজনে,
নববর্ষের শুভ সম্ভাষণে, হালখাতার শুভ সূচনায়
এসেছো 'জয় বাংলা' স্লোগানে, বাঙালির প্রাণে প্রাণে
তোমায় স্বাগতম, শুভ নববর্ষের জয়গানে ১৪২৯ সাল।

বৈশাখঃ নতুন স্বপ্নের বীজ

হাসান হাফিজ

'বৈশাখ' শব্দটি এক নিপুণ শিল্পীর
জলরঙে আঁকা ছবি
লাবণ্য টলটল করে
অন্তঃস্থিত সুঘ্রাণে মাতাল হই
এর দীপ্তি বিহ্বলতা রসের আবেশ
জড়িয়ে ভরিয়ে থাকে
মধুক্ষরা সম্মোহনে
নতুন স্বপ্নের বীজ বুনে চলে
মনোভূমে বৃষ্টিভেজা উর্বরা মাটিতে
আসবে শস্যমতী দিন, থাকবে না আকাল কাহাত
এইমত সনাতনী প্রগাঢ় বিশ্বাসে
'বৈশাখ' শব্দটি এক মায়াচ্ছন্ন প্রেরণারও উৎস বটে
প্রগতি পথের দিশা
শেকড়ের ঐতিহ্য-বাঁধন
অনিন্দ্য উজ্জ্বল কান্তি
অহংকারও–আশ্চর্য পরম!

অঙ্গীকার

রুস্তম আলী

নতুন দিনের নতুন ভাবনায়
জীবনের জড়তা মুছে
উজ্জ্বল কামনায়,
নতুন দিনের নতুন ভাবনায়
মহামিলন মহা-আনন্দে
অহংকার, ঘৃণা ও দুর্নীতি দূর করে–
হে নববর্ষ, শুভেচ্ছা তোমাকে।

নববর্ষ

নিকুঞ্জ কুমার বর্মন

নববর্ষ, নববর্ষ, শুভ নববর্ষ–
তোমাকে জানাই স্বাগতম,
আলো ছড়াক তোমার আগমন,
তোমার চন্দ্র সূর্য।
এমনি করে কত বছর কাটল জীবনে
মুছে যাক সব যাতনা তোমার সমীরণে
সুখি কর এ জগতে যারা নিঃস্ব।
দেশ গড়ার শপথ নিব তোমার অগ্নি জ্বেলে
ভেসে যাক সব পাপ তোমার সলিলে
অন্ধ যারা জানে না তারা– তোমার মঞ্জিমা
বোবার কাছে মলিন হয়ে যায় তোমার গরিমা
দাও হে আমায় শক্তির উৎস, হে নববর্ষ।

মাঝি

মো. কামাল শেখ

উথালপাথাল ঢেউয়ের তোড়ে
জীবন রেখে বাজি,
সবাই হলো অনেক কিছু
আমি হলাম মাঝি।

মাঝি আমি মাঝ দরিয়ার
মাতাল তুফান চিরে,
জীবন কাটে বৈঠাজলে
সবাই নামে তীরে।

নিত্যদিনই নিত্যনূতন
লোকের পারাপারে,
কেউ কোনোদিন এই মাঝি কে
খবর নিলো নারে।

ঝড়ের বছর জন্মেছিলাম
কুসুমছড়া গাঁয়ে,
কিশোর চোখে অনেক ছড়া
স্বপ্ন দিতো মায়ে।

কলিম মাঝির ছেলে আমি
সে কিছু নয় কম তো,
লেখাপড়া ছাড়লে আমায়
চলবে না একদম তো।

মানুষ হয়েই উঠতে হবে
সকল বাধা জয়ে,
পথ দেখালো হাত ধরে বাপ
স্বপ্ন দিলো মায়ে।

না অতীত না বর্তমান

ইজামুল হক

এক প্রজ্ঞাপন জারি করে
আমাকে নিষিদ্ধ করলে তুমি
প্রকাশিত কবিতা-বই-ম্যাগাজিন
সব, সবকিছু নিষিদ্ধ হলো আমার।

কার্তিকে জেগে ওঠা হিজলের ডাল
বর্ষার জলের জন্য
আমাকে যেভাবে কাঁদায়
আমি ঠিক সেভাবে কাঁদলাম।

বসন্তের বিষণ্ন বাতাস
শীত সকালের জন্য
আমাকে যেটুকু কাঁদায়
আমি ঠিক সেটুকু কাঁদলাম।

প্রথম যৌবনে এসে যেভাবে কেঁদেছি
শৈশব হারানোর ব্যথায়
আমি ঠিক সেভাবে কাঁদলাম।

তুমি আরও কাছের হলে
ঐ বর্ষার জল আর
শীত সকালের মতো
একান্ত আপন হলে তুমি।

জানি না কী ভেবে
পঁয়ত্রিশ বছর পর
হঠাৎ একদিন বেজে উঠলে তুমি।
আমাকে নিঃস্ব করে
তোমার নিয়মে তুমি
আবারও হারিয়ে গেলে
হে রহস্যময়ী;
সবকিছু দিয়েও তাই
কিছুই দিলে না তুমি।
না অতীত না বর্তমান।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশ

এস. এম. মাসুদ

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু থাকে,
বর্ষা এসে গ্রীষ্মকে যেন মধুর সুরে ডাকে।
শরৎ এসে বর্ষাকে দেয় কাশফুলের মালা,
বর্ষা বলে এখন বুঝি আমার যাবার পালা।
হেমন্ত এসে বলল শেষে তুমি এবার যাও,
শরৎ বলে যাচ্ছি তবে বিদায় দিয়ে দাও।
শীত এসে হেমন্তকে বলে শুনছো নাকি ভাই,
হেমন্ত বলে শুনবো পরে আমি এখন যাই।
সময়মতো বসন্ত এসে শীতকে দেয় তাড়া,
শীত বলে যাচ্ছিরে ভাই একটুখানি দাঁড়া।
গ্রীষ্ম এসে বলল শেষে একটু জায়গা দাও,
বসন্ত বলে তার চেয়ে বরং দখল করে নাও।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালালে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে ২৪শে মার্চ ২০২২ বঙ্গভবনে কিরগিজ রিপাবলিক, ফিনল্যান্ড, সিয়েরা লিওন, হাঙ্গেরি, মাল্টা ও কলম্বিয়ার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত/হাইকমিশনারগণ ফটোসেশনে অংশ নেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এক দশকে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণ।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, 'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে, যা গোটা বিশ্বে ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু এ বছরই যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। মেট্রোরেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলি টানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ।

জাপান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের যে ভিত রচিত হয়েছিল তা আজ বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে বিস্তৃত। জাপান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পুনর্গঠনে জাপানের অবদান এবং বাংলাদেশের অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতে জাপানের উন্নয়ন সংস্থা জাইকার ভূমিকা তুলে ধরেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস এবং জাপান-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাপানের সম্রাট নারুহিতো বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। ২২শে মার্চ বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ITO NAOKI বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে জাপানের সম্রাটের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা হস্তান্তর করেন। সম্রাট নারুহিতো অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করেন। এসময় রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে জাপানের বিনিয়োগ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। রাষ্ট্রপতি আশা করেন ভবিষ্যতেও দুই দেশের এ সম্পর্ক আরও সম্প্রসারিত হবে। সাক্ষাৎকালে জাপানের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে আগামীতেও জাপানের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

বীমা নিয়ে হয়রানি বন্ধ করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা মার্চ গণভবন থেকে 'জাতীয় বীমা দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বীমা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বীমা মানে আমানত। তাই কেউ যেন তার প্রাপ্য চাইতে গিয়ে হয়রানির শিকার না হয়। এসব বন্ধ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। দেশের বীমা খাতকে ডিজিটাইজ ও অটোমেশনের আওতায় আনার এবং এ খাতে নতুন নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা এপ্রিল ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকায় বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে আয়োজিত ১২১, ১২২ ও ১২৩তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের সনদ প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

তিনি বীমা নিয়ে মানুষের আস্থা বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেন। এ লক্ষ্যে গ্রাহকের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বীমা সেবা প্রদান করা, মানুষকে বীমার বিষয়ে আগ্রহী করতে নতুন নতুন পদ্ধতি কাজে লাগানোর, জনগণকে উৎসাহিত করতে ব্যাপক প্রচার চালানোর নির্দেশ দেন। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর আরব আমিরাত সফর : চার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মার্চ পাঁচ দিনের সফরে সংযুক্ত আরব আমিরাত যান। আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এবং আরব আমিরাত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান এবং তাঁকে ট্যাটিক গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। ৮ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী দুবাই এক্সিবিশন সেন্টারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'রিডিফাইনিং দ্য ফিউচার ফর উইমেন' শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন। একই দিন বিকেলে এক্সিবিশন সেন্টারে উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত পারস্পরিক স্বার্থে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে সম্মত হয়েছে। এছাড়া বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে চারটি সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষর হয়। প্রধানমন্ত্রী আমিরাতের জাতির মা শেখ ফাতিমা বিনতে মোবারকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে মার্চ সশরীরে পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ধানখালীতে বাংলাদেশ-চীন পাওয়ার কোম্পানির নির্মিত পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেন। পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী দেশে কোনো ঘর অন্ধকার থাকবে না উল্লেখ করে বলেন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার কার্যক্রম হাতে নিয়েছিলাম। আমাদের লক্ষ্য কোনো ঘর অন্ধকার থাকবে না। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবার ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। আলোর পথে যাত্রা সফল হয়েছে। তিনি মুজিববর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, রমজান ও ঈদ উপলক্ষে এ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে উপহার হিসেবে ঘোষণা করেন। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২ দশমিক ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে ১ হাজার একর জমিতে নির্মিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের ১৩তম দেশে পরিণত হয়েছে। এ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়াও আরেকটি পাওয়ার প্ল্যান্টের নির্মাণকাজ চলছে এবং সরকারের আরও একটি ১৩২০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট ও পায়রায় একটি সোলার সিস্টেম পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সশস্ত্রবাহিনীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯শে মার্চ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শরীয়তপুরের জাজিরায় 'শেখ রাসেল সেনানিবাস' উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বহিঃশত্রু আক্রমণ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সক্ষম করে তোলা হয়েছে বলে জানান। 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই পররাষ্ট্রনীতিতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বহিঃশত্রু আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সশস্ত্রবাহিনীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

সর্বজনীন পেনশনের আওতায় সাংবাদিকরা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, সাংবাদিকরাও সর্বজনীন পেনশনের আওতায় আসবে। ১লা মার্চ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকরা পেনশনের দাবি করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বজনীন পেনশন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সমাজের সব মানুষ এই পেনশন সুবিধার আওতায় আসবে, সাংবাদিকরাও আসবে।

সাংবাদিকরা এর আওতায় আসার ক্ষেত্রে প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষের একটি দায়দায়িত্ব আছে এবং থাকবে।

সাংবাদিকরা মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে পারে, যে মানুষটি স্বপ্ন দেখতে ভয় পায় তাকেও সাংবাদিকরা স্বপ্ন দেখাতে পারে উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, যারা অনুসন্ধানী রিপোর্ট করেন এবং হুমকির সম্মুখীন হয়েও সমাজে অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষকে নিয়ে লেখেন, আমি তাদেরকে 'স্যালুট' জানাই কারণ এ ধরনের রিপোর্ট দরকার। এ ধরনের রিপোর্ট সমাজকে পথ দেখায় এবং দায়িত্বশীলদের আরও দায়িত্ববান হতে তাগাদা দেয়। গণমাধ্যমে আজকে যে অগ্রগতি সেটি এবং কোনো অসংগতি থাকলে সেটিও তুলে ধরুন। আমাদের সরকার সমালোচনাকে সমাদৃত করার সংস্কৃতি লালন করে।

তিনি আরও বলেন, সাংবাদিকবান্ধব প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরেই সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট, তথ্য কমিশন গঠিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন সাংবাদিকবান্ধব নেতা ছিলেন। আজ কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে সমস্ত সাংবাদিক সাহায্য পাচ্ছে, অনুদান পাচ্ছে, এক্ষেত্রে কে কোন দলের, কে কোন মতের সেটি দেখা হচ্ছে না। যারা সরকারের সমালোচনা করেন তারাও সাহায্য পাচ্ছেন। করোনাকালে দেশের সকল অঞ্চলের সাংবাদিকরা সহায়তা পেয়েছে। সাংবাদিকদের ছেলেমেয়েরাও যাতে কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে সহায়তা পায় তার জন্য নীতিমালা হচ্ছে, সেই নীতিমালা খুব সহসা চূড়ান্ত হবে বলেও জানান মন্ত্রী। পরে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয় সভাকক্ষে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট-বিসিটিআই জার্নালের বঙ্গবন্ধু সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, সচিব মো. মকবুল হোসেন এবং বিসিটিআইর প্রধান নির্বাহী মো. আবুল কালাম আজাদ। মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

৭ই মার্চ যারা পালন করে না, তারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ৭ই মার্চ যারা পালন করে না তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে না। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তর করেছিলেন। ইতিহাসের পাতায় এটি একটি অসাধারণ ভাষণ। আজকে যারা ৭ই মার্চকে স্বীকার করে না তারা আসলে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বে কতটুকু বিশ্বাস করে সেটি নিয়েই প্রশ্ন দেখা দেয়।

এদিন সন্ধ্যায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডে তথ্য ভবন মিলনায়তনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আলোচনাসভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এই ভাষণে জাতির পিতা কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন কিন্তু তা এমনভাবে করেছেন, যে পাকিস্তানি শাসকদের চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। এই ভাষণ শুধু বাঙালিকেই মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেনি, বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য এটি পথের দিশারি।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৪ই মার্চ ২০২২ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও বঙ্গবন্ধু পরিবার' এবং 'জয় বাংলা জাতীয় স্লোগান-সুপ্রিম কোর্টের রায় ও পটভূমি' গ্রন্থ দুটির মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

সুখ সূচকে সাত ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

বিশ্বের সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ সাত ধাপ এগিয়ে ৯৪তম হয়েছে। গতবারের তালিকায় ১০১তম স্থানে ছিল বাংলাদেশ। জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশনস নেটওয়ার্ক (ইউএনএসডিএসএন) প্রকাশিত তালিকায় এবার ১৪৬টি দেশের অবস্থান প্রকাশ করেছে। ২০১২ সাল থেকে তারা এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।

১৮ই মার্চ প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ এবার পেয়েছে ৫.১৫৫ পয়েন্ট। গতবার পেয়েছিল ৫.০২৫ পয়েন্ট। এবারের প্রতিবেদনে বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশ হিসেবে উঠে এসেছে উত্তর ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ড। তাদের অর্জিত পয়েন্ট ৭.৮২১। সবচেয়ে নিচের অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। ফিনল্যান্ডের টানা পঞ্চমবারের মতো এই তালিকায় শীর্ষে অবস্থান রয়েছে। গ্যালাপ ওয়ার্ল্ড পোলের সরবরাহ করা উপাত্তের ভিত্তিতে ইউএনএসডিএসএন এই মূল্যায়ন তৈরি করে। এই জরিপে মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), সামাজিক সুরক্ষা,

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ৫ই এপ্রিল ২০২২ ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাসে '৫২তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যকর জীবনসহ মোট ছয়টি সূচক বিবেচনায় নেওয়া হয়। এবারের তালিকার শীর্ষ তিনটি দেশই উত্তর ইউরোপের অঞ্চলের।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফলপ্রসূ আলোচনা

আগামী ৫০ বছরে ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে আশাব্যঞ্জক আলোচনা হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। ৪ঠা এপ্রিল ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস আয়োজিত ৫২তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৪ সালে অক্টোবরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুক্তরাষ্ট্র সফর এবং তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় ভিত্তি পায়। তখন থেকেই দুদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ও বৈশ্বিক উভয় ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হতে থাকে। ইউএসএআইডির ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইসোবেল কোলম্যান সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মাহবুবুল আলম হানিফ।

বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা সংকট ইস্যু, র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি সুবিধা নিশ্চিত করার বিষয় স্থান পায়। এই সঙ্গে বৈঠকে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং ইন্দো-প্যাসিফিক প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হয়। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে সফল অর্থনৈতিক দেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও দৃঢ় ভিত্তিতে এগিয়ে যাবে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

অ্যাপে সুন্দরবন প্রবেশের টিকিট

এখন সুন্দরবনে প্রবেশের জন্য অনলাইনে টিকিট কাটতে পারবেন পর্যটকরা। বিশ্বের যে-কোনো প্রান্ত থেকে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে অগ্রিম টিকিট কাটা যাবে। এর জন্য ওয়েবসাইট ও অ্যাপস চালু করেছে সুন্দরবন বিভাগ। ৬ই মার্চ সুন্দরবন পশ্চিম বিভাগের কনফারেন্স রুমে অ্যাপস ও ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। ওয়েবসাইটে সুন্দরবনের পর্যটন এলাকাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

সুন্দরবনের দর্শনীয় স্থানগুলোর পরিচিতি ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে এই অ্যাপে। একজন পর্যটক কোথায় কতটুকু সময় অবস্থান করতে পারবে ও সেখানে দেখার মতো বিষয়গুলো আগে থেকেই জেনে নিতে পারবে। একদিনের জন্য সফর করার জন্য করমজল, গলাগাছিয়া, দোবেকি ও হারবাড়িয়ার মতো জায়গাগুলোতে পর্যটকেরা কখন প্রবেশ ও বের হতে পারবে তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাত্রি অবস্থানকালীন ট্যুরের জন্য নির্দেশনা এবং সুন্দরবন বিভাগের নিবন্ধনকৃত ট্যুর অপারেটরদের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এটুআই প্রকল্পের আওতায় ২০২০ সালের নভেম্বরে কাজ শুরু করে সুন্দরবন বিভাগ। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ আরও সহজ করাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দেশের সমুদ্রে সি-উইডের সন্ধান

দেশের সমুদ্রে সন্ধান মিলেছে ২০০ প্রজাতির সি-উইডের (এক ধরনের শৈবাল)। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ১০টি প্রজাতি বাণিজ্যিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এসব সি-উইড নানা ধরনের পুষ্টিসমৃদ্ধ ও ওষুধি গুণে ভরা। পশুপাখির খাবার তৈরির উপকরণ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এসবে রয়েছে ভিটামিন, খনিজ ও রোগ প্রতিরোধী এন্টিঅক্সিডেন্টস। যদি এ সম্পদকে কাজে লাগানো যায় তা ব্লু-ইকোনমিতে বিশাল ভূমিকা রাখবে। এটি সমুদ্রে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও ভূমিকা রাখবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

১৯শে মার্চ কক্সবাজারের একটি হোটেলের হলরুমে আয়োজিত 'সি-উইড অ্যান্ড গ্রিন মাসলস ফার্মিং অ্যান্ড ব্লু-ফুড ফেস্টিভ্যাল' অনুষ্ঠানে গবেষণার এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। ওয়ার্ল্ড ফিশ বাংলাদেশ-এর টিম লিডার প্রফেসর আবদুল ওয়াহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএইউ) সাবেক উপাচার্য আবদুস সাত্তার মণ্ডল। গবেষণার তথ্যমতে, কক্সবাজার উপকূলে তিন প্রকার খাবার উপযোগী সি-উইড পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে জলজ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে ব্লু-ইকোনমিতে সহায়তা করা সম্ভব হবে। স্বল্প খরচে সহজেই চাষ করা যায় বলে অনেক নারী ও যুবক সি-উইড চাষে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। বক্তারা বলেন, সি-উইড সমুদ্রের পানিতে থাকা কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদান শোষণের মাধ্যমে সমুদ্রের অতি উর্বরতা হ্রাসে সহায়তা করে।

পেনশন তহবিল: চাঁদা দেবে সরকার

দেশের সব নাগরিককে পেনশন সুবিধার আওতায় আনতে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

এলক্ষ্যে সার্বজনীন পেনশন তহবিলে নিম্ন আয়ের ও দুস্থ মানুষের চাঁদা সরকারের পক্ষ থেকে অনুদান হিসেবে দেওয়া হবে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইনের খসড়ায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। ২৯শে মার্চ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইনের খসড়া প্রকাশ করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। খসড়া আইনের সূচনায় বলা হয়েছে, দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। ফলে ভবিষ্যতে বয়স্ক নাগরিক বাড়বে। এই বয়স্ক নাগরিকদের বা নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার বলয়ে আনা প্রয়োজন। এজন্য জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য এই আইন করা হচ্ছে।

বিশ্বে উৎপাদিত ইলিশের ৮০ শতাংশ বাংলাদেশের

বিশ্বে যত ইলিশ মাছ উৎপাদিত তার ৮০ শতাংশই বাংলাদেশে উৎপাদন হচ্ছে বলে জানান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এমপি। ৩১শে মার্চ মুন্সীগঞ্জের লৌহজং সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি একথা বলেন। বিশ্বের কাছে ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশের যে অবস্থান তা সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং প্রধানমন্ত্রীর সময় উপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে। কেউ যেন জাটকা আহরণ, বিপণন ও বাজারজাত না করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অভয়াশ্রম করা, গবেষণা করাসহ এ খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা করছে বর্তমান সরকার। প্রতিবছর ৩১শে মার্চ থেকে আগামী ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালিত হয়। সেসময় মা ইলিশ আহরণ ও জাটকা আহরণ বন্ধ থাকায় মৎস্যজীবীরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন এজন্য ভিজিডির সাহায্য দেওয়া হয়। তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। তাই বাংলাদেশ আজ ইলিশ উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে ব্যাংকের সেবা

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪শে মার্চ নিজেই সোনালী ব্যাংকের নামকরণ করেন। ব্যাংক ব্যাবসার সম্প্রসারণ এবং পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে আপামর জনগণের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এ ব্যাংকের লক্ষ্য। পরবর্তীতে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী ২০০৭ সালের ৩রা জুন সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে স্বাধীনভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এ বছর ২৪শে মার্চ ৫০ বছর উদ্‌যাপন করল সোনালী ব্যাংক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক কন্টাকলেস ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে অনেক দূর এগিয়েছে। গত দুই বছর বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে বাসায় বসে প্রান্তিক মানুষের ব্যাংকিংয়ে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সোনালী ব্যাংক অন্যান্য সরকারি ব্যাংকের তুলনায় এগিয়ে।

ব্যাংকটির দেওয়া তথ্য মতে, ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সোনালী ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭৩ কোটি টাকা। গত বছর শেষে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা। ১৯৭২ সালে সোনালী ব্যাংক নিট মুনাফা করে ২৪ লাখ টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির মুনাফা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত যে-কোনো ব্যাংকের চেয়ে বেশি। ১৯৭২ সালে ৩১শে ডিসেম্বর সোনালী ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রীমের পরিমাণ দাঁড়িয়ে ৬৯ হাজার কোটি টাকা। ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সোনালী ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৩৯ কোটি টাকা। ২০২১ সাল শেষে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা।

প্রাথমিক স্কুলে 'ওয়াইফাই' দিচ্ছে সরকার

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ওয়াইফাই সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২২শে মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এ তথ্য জানান। রাজধানীর একটি হোটেলে সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোয় ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা জানান। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার জন্য বরাদ্দকে সরকার ব্যয় মনে করে না, একে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ মনে করে। কারণ আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীর বাংলাদেশকে সম্পদে ও সুনামে ভরিয়ে দেবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি নির্মাণ করে, তাই মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার সম্ভবমতো সব কিছুই করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৬৫ হাজার ৯৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ওয়াইফাইয়ের আওতায় নেওয়া হবে। এর ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ১০ জন শিক্ষককে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেওয়া হবে। ওয়াইফাই থেকে মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষকরা অনলাইনে শ্রেণি কার্যক্রম চালাতে পারবে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ফেলে দেওয়া পণ্য থেকে ডলার আসছে বাংলাদেশে

মাছের আঁশ, সেলুন থেকে চুল, পরিত্যক্ত সুতা ও কাপড় এবং ছাইকে একসময় বাতিল বা ফেলে দেওয়ার জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু এসব পণ্যই বাংলাদেশে এখন বৈদেশিক মুদ্রা আনতে শুরু করেছে। বিদেশের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে রীতিমতো শিল্প আকারে এসব পণ্যের সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানির ব্যাবসা শুরু হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এসব ব্যাবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। ২রা এপ্রিল গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব জানা যায়।

মাছে-ভাতে বাঙালি হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাছ বরাবরই জনপ্রিয় থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ২০০ কোটি টাকার বেশি মাছের আঁশ সাত-আটটি দেশে রপ্তানি হয়। বাংলাদেশ থেকেই প্রতিবছর প্রায় আড়াই হাজার টন আঁশ রপ্তানি হয় জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোয়। সেখানে মাছের আঁশ থেকে কোলাজেন ও জিলেটিন তৈরি করা হয়। ওষুধ, প্রসাধন সামগ্রী,

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ৩০শে মার্চ ২০২২ ঢাকায় ম্যারিয়ট কনভেনশন সেন্টারে উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স (উই) আয়োজিত '৫ম কালারফুল ফেস্ট ২০২২'-এর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন– পিআইডি

ফুড সাপ্লিমেন্ট তৈরিতে মাছের আঁশ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কোলাজেন ও জিলেটিন মাছের আঁশ দিয়ে তৈরি হয়, যা ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রীতে কাজে লাগে।

নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাটের তিনটি জেলায় বাতিল সুতার ওপর ভিত্তি করে বিশাল কুটিরশিল্প তৈরি হয়েছে। বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়নের শাওল বাজারে শুধু এসব পরিত্যক্ত সুতার বিশাল একটি বাজার তৈরি হয়েছে। সারা দেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলোর পরিত্যক্ত সুতা এখানে নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সুতা থাকে-কটন, নাইলন, পলিয়েস্টার, উল বহু ধরনের সুতা থাকে। সেখানে এসব সুতা আলাদা আলাদা করা হয়। এরপর ওই এলাকায় কোন কোন রঙের চাহিদা আছে, সেগুলো আলাদা করে রাখা হয়। অন্যান্য রঙের যেসব সুতা বাকি থাকে, সেগুলোকে আবার ডায়িং বা রং করার জন্য পাঠানো হয়। পরে এসব সুতা কিনে নেন এসব জেলার তাঁতিরা। চরকা বা নাটাইয়ের সাহায্যে সুতা আলাদা করা হয়। এরপর কেজি আকারে বিক্রি হয়। এসব সুতা ১২০ থেকে শুরু করে মানভেদে ৭০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। এসব জেলায় ১০ হাজারের বেশি তাঁতি রয়েছে। তাদের কেউ কম্বল, কেউ বিছানার কাপড়, শাল চাদর, গামছা বা লুঙ্গি তৈরি করেন। তারা সবাই এখান থেকে পরিত্যক্ত সুতা কিনে নিয়ে তাঁতে বুনে নতুন নতুন পণ্য তৈরি করেন।

ছাই বিক্রি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব, দুই দশক আগে সেটা কেউ চিন্তাও করেনি। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ছাই রপ্তানি করেই বাংলাদেশের আয় হয়েছে তিন কোটি ২১ লাখ ৮৭ হাজার ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে লাভজনক রপ্তানিযোগ্য ছাইয়ে পরিণত হয়। এখন প্রায় সবগুলো বড়ো ইস্পাত কোম্পানি এই ব্যাবসায় জড়িত হয়েছে। চীন, ভারত, স্পেন, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক ইত্যাদি দেশে এই ছাই রপ্তানি হয়। এগুলো মূলত কালি ও প্রিন্টারের কার্টিজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বাইরে পাটকাঠি থেকে তৈরি করা অ্যাকটিভেটেড চারকোলও তৈরি হচ্ছে এবং চীনে রপ্তানি শুরু হয়েছে।

পাটকাঠিকে ৪৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আট থেকে ১০ ঘণ্টা বিশেষ চুল্লির মাধ্যমে পুড়িয়ে এবং সেটাকে চূর্ণ করে চারকোল তৈরি করা হয়। এছাড়া ধান ভাঙানো তুষেও চারকোল করা হয়। রাজশাহী, গাজীপুর, রাজবাড়ী, জামালপুর, পাবনা, ফরিদপুরে বাণিজ্যিকভাবে চারকোল তৈরি করা হচ্ছে। এসব চারকোলে থাকা কার্বনের বিদেশে চাহিদা রয়েছে। এ দিয়ে ফটোকপি ও প্রিন্টারের কালি, ওষুধ, দাঁত পরিষ্কারের সামগ্রী, পানির ফিল্টার তৈরি করা হয়।

স্যালুন বা পার্লারে গিয়ে চুল কাটানো বহু পুরনো ঘটনা হলেও, সেই কাটানো চুল বা ফেলে দেওয়া চুল হয়ে উঠেছে অনেকের জীবিকার উৎস। শুধু দেশের বাজারেই নয়, এসব চুল থেকে প্রতিবছর শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাও আসছে। এসব চুল দিয়ে উইগ বা পরচুল তৈরি করা হয়। বাংলাদেশেই এখন উইগের রীতিমতো কারখানা তৈরি হয়েছে।

শতকোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ফেলনা এসব চুল রপ্তানি করে। দেশের বাইরে সবচেয়ে বেশি এ ধরনের চুল যাচ্ছে ভারতে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৫৫ লাখ ডলারের বেশি মূল্যের এ ধরনের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

নওগাঁ ও ঠাকুরগাঁওয়ে দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ

'বঙ্গবন্ধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নওগাঁ' এবং 'ঠাকুরগাঁও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়' নামে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি আলাদা আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ২৮শে ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয় দুটির খসড়া অনুমোদন দেন। প্রস্তাবিত নওগাঁ ও ঠাকুরগাঁও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো ৫২টি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০৮টি।

শতভাগ মানুষকে শিক্ষিত করার আশাবাদ ব্যক্ত

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৬ই এপ্রিল ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ৭ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। মিরপুর পুলিশ কনভেনশন হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। সরকার শতভাগ মানুষকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি গ্রাজুয়েটদের মেধা, প্রজ্ঞা ও কর্ম দিয়ে স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৩ হাজার ৭৪৪ জন গ্র্যাজুয়েট অংশগ্রহণ করেন।

এমপিওভুক্তির তালিকায় ২৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

নতুন এমপিওভুক্তির জন্য সারা দেশ থেকে প্রায় সাড়ে সাত হাজার স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন করা হয়। এর মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির নীতিমালা অনুযায়ী সব শর্ত পূরণ করেছে। এ তালিকা চূড়ান্ত করতে চান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন পেলে মে মাসের মধ্যে নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করা হবে। ৪ঠা এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির যাচাই-বাছাই কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সবাই উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনঃ মো. সেলিম

বিনিয়োগঃ বিশেষ প্রতিবেদন

পাঁচ বছরে ৪৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে আইএফসি

বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ করতে চায় বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ সংস্থা আইএফসি। আগামী পাঁচ বছরে সংস্থাটি ৫০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ করবে তারা, যা দেশীয় মুদ্রায় ৪৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এই অর্থ হালকা প্রকৌশল, অর্থনৈতিক অঞ্চল, আর্থিক ও পুঁজিবাজার এবং প্রবৃদ্ধি সহায়ক টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করবে বলে ২৫শে মার্চ সংস্থাটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সংস্থাটির একজন শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করছেন। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করা ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম উৎসাহিত করতে এই বিনিয়োগ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আইএফসির দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক হেক্টর গোমেজ অ্যাং পাঁচ দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন। এই সফরে তিনি ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সম্ভাব্য ক্রেতা ও অংশীদারদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সফরে গোমেজ অ্যাংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের জন্য সম্প্রতি নিযুক্ত আইএফসির কান্ট্রি ম্যানেজার মার্টিন হোল্টম্যান এবং আইএফসি শিল্প বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর সঙ্গে এক বৈঠক শেষে হেক্টর গোমেজ অ্যাং বলেন, লক্ষ্য পূরণ করতে বাংলাদেশকে আরও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। তাঁর মতে, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরোনো বা এলডিসি উত্তরণের পর চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বাংলাদেশ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণ করতে হবে, টেকসই উন্নয়নের জন্য এর বিকল্প নেই।

তাসখন্দ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ফোরাম উভয় দেশে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক বলেন, তাসখন্দ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ফোরাম যে সুযোগ তৈরি করেছে, আমি আশা করি– উভয় দেশ এ বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করে নিজ নিজ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করবে। ২৬শে মার্চ ২০২১ উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে বাংলাদেশ দূতাবাস, উজবেকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের ৫১তম স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী একথা বলেন। এসময় তাসখন্দে উজবেকিস্তানের আইসিটি মন্ত্রী sherzod Icho to Movich shetmatov, উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর আলম, উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন।

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বীরত্বের ইতিহাস। স্বাধীনতার জন্য শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বাঙালি জাতি চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে স্বাধীনতা এনে দিতে সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর, তিনি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দেওয়ার সময় পাননি। এখন তাঁর অসমাপ্ত কাজটি তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষতার সঙ্গে করে যাচ্ছেন। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সোনার বাংলা গড়তে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সেবায় নতুন মাত্রা সংযোজন করা হয়েছে।

প্রতিবেদনঃ এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

সমতাভিত্তিক সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিবারের মতো এবারো ৮ই মার্চ বিশ্বব্যাপী পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। জাতিসংঘ ২০২২ সালের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'নারীর সুস্বাস্থ্য ও জাগরণ'। এই প্রতিপাদ্যের আলোকে

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৮ই মার্চ ২০২২ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন জয়িতাকে সম্মাননা প্রদান করেন– পিআইডি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– 'টেকসই আগামীর জন্য, জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য'। দেশব্যাপী সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করেছে।

দিবসটি উপলক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সারা দেশে শোভাযাত্রা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তাঁরা।

অপরাজিতা সম্মাননা পেলেন ৮ জন নারী

কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখায় 'এমজিআই বাঘবাংলা অপরাজিতা' সম্মাননা পেয়েছেন ৮ জন নারী। ১লা মার্চ রাজধানীর এক হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে যৌথভাবে এ পুরস্কার দিয়েছে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ও বাঘবাংলা এন্টারটেইনমেন্ট।

৮টি ক্যাটাগরিতে যারা পুরস্কার পেলেন– মুক্তিযুদ্ধে রোকেয়া কবীর, ভাষা-সাহিত্যে নাসরীন জাহান, শিল্প-সংস্কৃতিতে কনকচাঁপা চাকমা, উদ্যোক্তায় রুবানা হক, বিনোদনে অপি করিম, তথ্যপ্রযুক্তিতে তনজিবা রহমান, খেলাধুলায় সালমা খাতুন ও তৃণমূলের আলোকিত নারীতে মিলন চিসিম।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

ঘর পাচ্ছে আরও ৫০ হাজার পরিবার

মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে দ্বিতীয় ধাপে এপ্রিলে ঘর পাচ্ছেন আরও ৫০ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার। তৃতীয় ধাপে জুনে আরও ৫০ হাজার পরিবারকে ঘর দেবে সরকার। ঘর তৈরির ডিজাইনে এসেছে পরিবর্তন। ঘরপ্রতি বাজেট বেড়েছে ২০ হাজার টাকা।

১১ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সভা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের সব বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকসহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। এর আগে প্রথম ধাপে সারা দেশে প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৭০ হাজার ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে ঘর উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন-গৃহহীন যেসব হাজার হাজার পরিবারকে ঘর করে দিয়েছেন সেই উদ্যোগ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এতে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেন, প্রথম পর্যায়ে গৃহনির্মাণ কার্যক্রমে সারা দেশে প্রশংসা হয়েছে। কাজের গুণগতমান ধরে রাখতে হবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. মাহবুব হোসেন বলেন, এবার আমরা যে ঘরটি করব সেটির ডিজাইনে কিছু পরিবর্তন এসেছে। একইসঙ্গে ঘরের বাজেটের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী মনে করেছেন যে আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। সেজন্য ঘর প্রতি ২০ হাজার টাকা বাজেট বাড়ানো হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি ঘরের জন্য পরিবহণ খরচসহ ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। এবার তা বাড়িয়ে ১ লাখ ৯৫ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

বিএডিসির নতুন ২০ জাতের আলু চাষ

কুষ্টিয়ায় প্রথমবারের মতো বিএডিসি (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন) রপ্তানি ও শিল্পের ব্যবহারের উপযোগী ২০টি নতুন জাতের আলুর চাষ করেছে। সদর উপজেলায় প্রায় দুই একর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এসব জাতের আলুর চাষ করা হয়েছে। প্রচলিত জাতের চেয়ে দ্বিগুণ ফলন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় এসব জাতের আলু চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন কৃষকরা। সরকারের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিএডিসির এই উদ্যোগ দেশব্যাপী বড়ো ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছেন কৃষি কর্তকর্তারা।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ৭ই এপ্রিল ২০২২ মানিকগঞ্জে কৃষকদের মাঝে উন্নতমানের পেঁপের চারা বিতরণ করেন– পিআইডি

কুষ্টিয়া বিএডিসি সূত্রে জানা যায়, ২০২১-২০২২ মৌসুমে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি গ্রামে মাল্টি লোকেশন পারফরমেন্স যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রায় দুই একর জমিতে ২০টি নতুন জাতের আলুর প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করে কুষ্টিয়া বিএডিসি হিমাগার। মানসম্মত বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে এসব জাতের আলুর চাষ করা হয়। জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে– সানশাইন, প্রাডা, সান্তানা, এডিসন, কুইন এনি, ল্যাবেলাসহ আরও কয়েকটি জাত। এসব আলুর ড্রাই ম্যাটার বেশি হওয়ায় রপ্তানি ও শিল্পে ব্যবহার উপযোগী এবং রোগবালাই প্রতিরোধী। বিএডিসির তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে ৫ লাখ হেক্টর জমিতে ১.৬ কোটি মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে দেশের চাহিদা মেটাতে ৮০ লাখ মেট্রিক টন আলু ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট আলু রোগ বালাইয়ের কারণে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। নতুন এসব জাতের

আলু চাষ করে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। প্রচলিত জাতের আলুর ফলন হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২২ টন। কিন্তু নতুন জাতের আলুর ফলন ৪০ টনের বেশি। পুরাতন জাতের চেয়ে নতুন জাতের আলুর ফলন প্রায় দ্বিগুণ। একই খরচে অধিক ফলনের পাশাপাশি জমি কম ব্যবহার করা যাবে। আশা করা যাচ্ছে, নতুন জাতের আলুর বীজ কৃষক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে পারলে আলুর ফলন বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ ও রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বিরাট এক মাইলফলক অর্জিত হবে।

বিশ্বব্যাংক দেবে ১২ কোটি ডলার

'ক্লাইমেট স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট'র আওতায় ১২ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় এক হাজার ২০ কোটি টাকা। ১৫ই মার্চ শেরে বাংলা নগরের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে (ইআরডি) বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে চুক্তি সই হয়েছে। ইআরডি সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন ও বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ড্যান চেন চুক্তিতে সই করেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার ১৮২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংকের ঋণ এক হাজার ২০ কোটি টাকা। বাকি ১৬২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা সরকারি নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো হবে। অনুমোদন পেলে চলতি বছর থেকে শুরু হয়ে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর। পুরো ঋণের ওপর ০ দশমিক ২৫ শতাংশ হারে সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ (রেয়াতকাল) ৩৫ বছরে ঋণটি পরিশোধযোগ্য।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো– অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে জলবায়ুসহিষ্ণু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, কৃষিতে পানির দক্ষতা ব্যবহার ও ক্লাইমেট স্মার্ট পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেচ কাঠামো এবং অন্যান্য সব কাজের গুণগত মান রক্ষা করে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বাড়ানো। এছাড়া প্রকল্প এলাকার উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও কমপক্ষে ১২টি ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি সম্প্রসারণপূর্বক প্রকল্প এলাকায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচের পানির ব্যবহার শতকরা ৫০ শতাংশ সাশ্রয়ী করা, ক্লাইমেট স্মার্ট মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রবর্তনের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ২০ শতাংশ বাড়ানো।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

শব্দদূষণ রোধে ১০টি সুপারিশ

শব্দদূষণ রোধে হাসপাতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে হর্ন না বাজানোসহ ১০ দফা সুপারিশ করেছে বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) এবং ইকিউএমএস কনসালটিং লিমিটেড। ৩রা মার্চ 'আন্তর্জাতিক শ্রবণ দিবস' উপলক্ষে প্রতিষ্ঠান দুটি অনলাইনে আয়োজিত 'প্রাণ প্রকৃতির উপর শব্দদূষণের প্রভাব ও প্রতিকার' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে এসব সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সুপারিশ তুলে ধরেন, ক্যাপসের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার।

সংগঠন দুটির অন্য সুপারিশগুলো হচ্ছে– বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের আওতায় পরিবেশ ক্যাডার ও পরিবেশ পুলিশ নিয়োগ দেওয়া, বিধিমালা সংজ্ঞা অনুযায়ী চিহ্নিত জোনসমূহে (নীরব, আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও মিশ্র) সাইনপোস্ট উপস্থাপন করা ও তা মানার বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করা, ৯৯৯-এ কল সার্ভিসের পাশাপাশি অনলাইনে ই-মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দণ্ড প্রদান করা, পরিবেশ অধিদফতরের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশ, সিটি করপোরেশন, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য প্রশাসনিক দফতরের সমন্বয় সাধন করা, হাইড্রোলিক হর্ন আমদানি বন্ধ নিশ্চিত করা, হর্ন বাজানো শাস্তি বৃদ্ধি, চালকদের শব্দ সচেতন করা, উচ্চ শব্দ এলাকায় ইয়ার মাফসহ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার করা, ছাদ, বারান্দা, খোলা জায়গায় গাছ লাগানো (গাছ শব্দ শোষণ করে) এবং সন্ধ্যার পর ছাদ ও কমিউনিটি হলে গান-বাজনা না করা, ব্লেন্ডার, প্রেশার কুকার ও ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার না করা, ড্রিল ও গ্রাইন্ডিং মেশিনের ব্যবহার সীমিত করা।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ডায়াবেটিসের নতুন কারণ আবিষ্কার

মানুষের অন্ত্রের এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ কমে যাওয়া ডায়াবেটিসের কারণ। এ কারণ বিশ্বের বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের অজানা ছিল। আর এ নতুন কারণটি আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা। ২৩শে মার্চ রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির উপদেষ্টা অধ্যাপক মধু এস মালো।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মানুষের পাকস্থলির শেষ অংশ থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত দীর্ঘনালি বা অন্ত্রে থাকে ইনটেস্টিনাল অ্যালকালাইন ফসফাটেস বা আইএপি নামের এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। যাদের শরীরে আইএপি কম থাকে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেশি। মানুষের অন্ত্রে কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়া থাকে। মৃত ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর থেকে তৈরি হওয়া টক্সিনকে ধ্বংস করে আইএপি অন্ত্রে আইএপি কমে গেলে টক্সিন ধ্বংস হয় না বা কম ধ্বংস হয়। ফলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিক সমিতি, বারডেম হাসপাতাল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ জন গবেষক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এ গবেষণায় যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এই গবেষণা পরিচালিত হয়। গবেষকেরা এটিকে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার বলে মনে করছেন। এর ফলে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ সহজতর হবে এবং ডায়াবেটিস চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

দেশে প্রথমবারের মতো প্রতিস্থাপিত মেকানিক্যাল হার্ট

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো 'মেকানিক্যাল হার্ট' প্রতিস্থাপন করেছেন একদল চিকিৎসক। ২রা মার্চ রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে একজন নারীর হৃদপিণ্ডে 'মেকানিক্যাল হার্ট' বা লেফট

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ৩১শে মার্চ ২০২২ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার ২০২০' প্রদান করেন– পিআইডি

ভেন্ট্রিকুলার এসিস্ট ডিভাইস (এলভ্যাড) স্থাপন করা হয়। ৩রা মার্চ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪২ বছর বয়স্ক এই নারী দীর্ঘদিন ধরে হৃদপিণ্ডের নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। দেশে-বিদেশে চিকিৎসার পরও তার হৃদপিণ্ড প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। এ রকম রোগীর একমাত্র চিকিৎসা হৃদপিণ্ড প্রতিস্থাপন। তবে প্রতিস্থাপনের জন্য সুস্থ হৃদপিণ্ড পাওয়া না গেলে 'মেকানিক্যাল হার্ট' ইমপ্ল্যান্ট বা এলভ্যাড স্থাপন করা হয়। চিকিৎসকেরা চার ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীর হৃদপিণ্ডের বাম নিলয়ে 'হার্টমেট-৩' নামের একটি মেকানিক্যাল হার্ট স্থাপন করেন এবং হৃদপিণ্ডের কার্যকারিতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন।

এসএমএ রোগের চিকিৎসা এখন দেশে

বিরল স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রাফি (এসএমএ) রোগের চিকিৎসা প্রথমবারের মতো দেশে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি মার্চ মাসে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ইনস্টিটিউটের নিউরোলজি বিভাগে পাঁচ মাস বয়সি এক শিশু রোগীর চিকিৎসা শুরুর মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়।

মানুষের শরীরের মাংসপেশির অতিরিক্ত ক্ষয়িষ্ণুতা এসএমএ রোগের মূল লক্ষণ। শরীরের কার্যক্ষমতা দুর্বল করতে করতে একসময় মৃত্যু ডেকে আনে। চিকিৎসা না পেলে নিশ্চিত মৃত্যু হয় এই রোগীদের। চিকিৎসকেরা জানান, এই রোগের ধরন চারটি। এরমধ্যে টাইপ ওয়ান বাচ্চাদের হয়। দুই বছরের মধ্যে চিকিৎসা না পেলে বাচ্চা মারা যায়।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকায় নতুন তিন রুটে ২২৫টি বাস

রাজধানীতে গণপরিবহণে শৃঙ্খলা আনতে বাস রুট রেশনালাইজেশনের অংশ হিসেবে যাত্রা শুরু হয়েছে 'ঢাকা নগর পরিবহণ' কোম্পানির বাস চলাচল। এর ধারাবাহিকতায় নতুন তিনটি রুটে আরও ২২৫টি বাস নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি। আগামী ৯০ দিনের মধ্যে প্রস্তুতিমূলক সব কাজ শেষ করা হবে বলে জানিয়েছে কমিটি। ২২শে মার্চ বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটির ২২তম সভা শেষে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান কার্যালয় নগরভবনে বুড়িগঙ্গা হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে কমিটির সভাপতি ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস সাংবাদিকদের জানান, নতুন তিনটি রুটের মধ্যে ২২ নম্বর রুটে ৫০টি, ২৩ নম্বর রুটে ১০০টি ও ২৬ নম্বর রুটে ৭৫টি বাস সব মিলিয়ে নতুন করে ২২৫টি বাস নামানো হবে।

এর মধ্যে ২২ নম্বর রুটটি হলো ঘাটারচর থেকে বছিলা, মোহাম্মদপুর টাউন হল, ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, শাহবাগ হয়ে সুলতানা কামাল সেতু পর্যন্ত। ২৩ নম্বর রুট হচ্ছে বছিলা থেকে মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ, শ্যামলী, কমলাপুর হয়ে কাঁচপুর পর্যন্ত। আর ২৬ নম্বর রুট হলো ঘাটারচর থেকে পলাশী মোড়, পোস্তগোলা হয়ে কদমতলী পর্যন্ত। ঢাকার গণপরিবহণের মালিকের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। আর ঢাকা ও আশপাশে ২০০-এর বেশি পথে (রুট) বাস চলাচল করে। যাত্রী তোলার জন্য এক বাসের চালক অন্য বাসের সঙ্গে পাল্লায় লিপ্ত হন। ফলে দুর্ঘটনা বাড়ে। এ ব্যবস্থা পরিবর্তনে ২০০৪ সালে ঢাকার জন্য করা ২০ বছরের পরিবহণ পরিকল্পনায় 'বাস রুট রেশনালাইজেশন' বা বাস রুট ফ্র্যাঞ্চাইজ চালু করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশেষ এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে লক্কড়ঝক্কড় বাস তুলে নেওয়া। সহজ শর্তের ঋণে নতুন বাস নামানো। বাস চলবে পাঁচ-ছয়টি কোম্পানির অধীন। মালিকরা বিনিয়োগের হার অনুসারে লভ্যাংশ পাবেন।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

বিদ্যুৎ : বিশেষ প্রতিবেদন

মুজিববর্ষে আলোকিত প্রতিটি ঘর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষে আমরা প্রতিটি ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালাতে পারলাম, এটাই হচ্ছে সব থেকে বড়ো কথা। আমরা আলোকিত করেছি এ দেশের মানুষের প্রত্যেকটা ঘর। তিনি বলেন, ওয়াদা করেছিলাম, প্রতিটি মানুষের ঘর বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত করব। প্রতিটি মানুষ আলোকিত হবে। আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছি। ২১শে মার্চ পটুয়াখালীর কলাপাড়ার ধানখালীতে নির্মিত পায়রা ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্‌বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্‌বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, ১৯৯৬ সালে ২১ বছর পর সরকার গঠন করি। বিদ্যুতের জন্য তখন হাহাকার। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। সামান্য কিছু লোক বিদ্যুৎ সুবিধা পেত। আমরা উদ্যোগ নিলাম বেসরকারি খাতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করব। মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেব। সেসময় মাত্র ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম। পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা ৪ হাজার ৩০০

মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হই। তিনি আরও বলেন, দুর্ভাগ্য আবার ২০০১ থেকে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের সময় দেখলাম ৪ হাজার ৩০০ থেকে কমে ৩ হাজার ২০০-তে নেমে আসে বিদ্যুৎ উৎপাদন। ২০০১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত যারা ক্ষমতায় ছিল তাদের মধ্যে এ দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কোনো আন্তরিকতা ছিল না। এটাই হচ্ছে এ দেশের মানুষের দুর্ভাগ্য। সুধী সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ২০০৯ সাল থেকে ১৩ বছর একটানা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অব্যাহত রয়েছে। এর মাঝে ঝড়ঝাপটা অনেক এসেছে। বাধা অনেক এসেছে। সে বাধা আমরা অতিক্রম করেছি বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে। ওয়াদা করেছিলাম প্রতিটি মানুষের ঘর আলোয় আলোকিত করব। প্রতিটি মানুষ আলোকিত হবে। আজকের দিনটার মধ্য দিয়ে আলোর পথে আমাদের যাত্রা শুরু। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং পায়রা বন্দর থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা সেসব এলাকায় পথসহ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছি।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

মুন্সীগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জ রুটে চালু হচ্ছে সি-ট্রাক

মুন্সীগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জ রুটে চালু হয়েছে সি-ট্রাক চলাচল। বিআইডব্লিউটিসি পরিচালিত এই সি-ট্রাক ২৪শে মার্চ থেকে পুরোপুরি চালু হয়। এমনটিই জানান বিআইডব্লিউটিসি চেয়ারম্যান অতিরিক্ত সচিব আহমদ শামীম আল রাজী। তিনি আরও জানান, যাত্রী নিরাপত্তায় এই রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রী দুর্ভোগ লাঘবে সি-ট্রাক চালু হয়েছে।

চালু হলো 'মিতালী এক্সপ্রেস'

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস থেকে চালু হয়েছে 'মিতালী এক্সপ্রেস'। বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী এ রেল রুট উদ্‌বোধন করার ঠিক এক বছরের মাথায় ঢাকা থেকে চিলাহাটি হয়ে ভারতে প্রবেশ করবে ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি 'মিতালী এক্সপ্রেস'। এর মধ্য দিয়ে ওই রুটে দীর্ঘ প্রায় ৫৮ বছর পর আবার যাত্রীবাহী ট্রেন চলবে। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে সব ধরনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ছিটমহল বিনিময় চুক্তির পর ভারত-বাংলাদেশ রেল যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয় এই দেশ। ২০২০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন আন্তর্জাতিক হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রেল রুটের। শুরু হয় পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা। এরপর ২০২১ সালের ২৭শে মার্চ ভার্চুয়ালি দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যাত্রীবাহী মিতালী এক্সপ্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় ট্রেনটি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশের রেল মন্ত্রণালয়।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

৪০তম বিসিএসে ১৯৬৩ জন নিয়োগের সুপারিশ

সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) ৩১শে মার্চ ২০২২ ওয়েবসাইটে ৪০তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে। ৪০তম বিসিএসে ১ হাজার ৯৬৩ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রশাসন ক্যাডারে ২৪৫, পুলিশে ৭২, পররাষ্ট্রে ২৫, কৃষিতে ২৫০, শুল্ক ও আবগারিতে ৭২, সহকারী সার্জন ১১২ ও পশুসম্পদে ১২৭ জনসহ মোট ১ হাজার ৯৬৩ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশ করা হয়েছে।

২৭শে জানুয়ারি ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। এতে ১০ হাজার ৯৬৪ জন পাস করেন। ২০১৮ সালের আগস্টে ৪০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। ৪০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আবেদন করেছিলেন ৪ লাখ ১২ হাজার ৫৩২ প্রার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছেন ৩ লাখ ২৭ হাজার পরীক্ষার্থী। তাদের মধ্যে প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ হন ২০ হাজার ২৭৭ জন।

দুই বিসিএস থেকে নিয়োগের সুপারিশ পেলেন ৮৮৩

৪২তম বিশেষ বিসিএস থেকে ৫৩৯জন চিকিৎসক ও ৩৮তম বিসিএস থেকে ৩৪৪ জনকে নন ক্যাডারে নিয়োগের সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ২৯শে মার্চ ২০২২ এক সভা শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পিএসসি জানায়, ৪২তম বিসিএস থেকে প্রথম শ্রেণির নবম গ্রেডে ও ৩৮তম বিসিএস থেকে ১০ম গ্রেডে ৩২০ ও ১১ নম্বর গ্রেডে ২৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

পুলিশে ইন্সপেক্টর পদে ১২৩ জনের পদোন্নতি

বাংলাদেশ পুলিশে উপপরিদর্শক (এসআই) থেকে ১২৩ জনকে পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্তদের মধ্যে ৬৭ জনকে পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ৩৯ জনকে পরিদর্শক (সশস্ত্র) এবং ১৭ জনকে পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন) পদোন্নতি পেয়েছেন। পুলিশ সদর দপ্তরের ১১ই এপ্রিল, ২০২২ তারিখের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ড. বেনজীর আহমেদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত জনগণের পুলিশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় পুলিশকে দক্ষ ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যমান পদোন্নতি পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ছেঁউড়িয়ায় লালন স্মরণোৎসব

ছেঁউড়িয়ার আখড়াবাড়িতে ১৫ই মার্চ থেকে শুরু হয় তিনদিনের লালন স্মরণোৎসব। করোনার কারণে টানা দুই বছর বন্ধ ছিল লালন স্মরণোৎসব ও লালন তিরোধান দিবসের আয়োজন। মহামারির

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২৪শে মার্চ ২০২২ শাপলা হলে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' পুরস্কার প্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি

সংকট কাটিয়ে দীর্ঘদিন পর সাঁইজির ধামে মিলিত হতে পারায় খুশি সাধুভক্তরা। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তিনদিনের লালন স্মরণোৎসবের আয়োজন করেছে কুষ্টিয়ার লালন একাডেমি। 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি' বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের এই আধ্যাত্মিক বাণীর স্লোগানে শুরু হয়ে উৎসব চলে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত। তিন দিনের এই উৎসবে লালনের কর্মময় জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান ও গ্রামীণ মেলার আয়োজক করা হয়।

পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত সনজীদা খাতুন

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ড. সনজীদা খাতুনকে ভারত সরকারের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী ২৯শে মার্চ সনজীদা খাতুনের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। এসময় ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়।

শিল্পকলায় বিশেষ অবদান রাখায় সনজীদা খাতুনকে এ খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। ভারতের ৭১তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে তাঁকে সম্মানিত করার ঘোষণা দেয় দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ড. সনজীদা খাতুন একজন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৬০ সালের শুরুর দিকে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ছায়ানটেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর তত্ত্বাবধানে ছায়ানট এখন একটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান, যা শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্য প্রসারে কাজ করছে। গত বছরের ২১শে নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে অংশ নিতে পারেননি সনজীদা খাতুন। তাই এ পুরস্কার হস্তান্তর করলেন ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী। তিনি একাধারে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, লেখক, গবেষক, সংগঠক, সংগীতজ্ঞ এবং শিক্ষক। বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া তিনি জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদেরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রচলিত ধারার বাইরে ভিন্নধর্মী শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নালন্দার সভাপতিও তিনি।

সনজীদা খাতুন ১৯২১ সালে একুশে পদক, ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার প্রভৃতি সম্মাননায় ভূষিত হন।

প্রতিবেদনঃ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

জেলা-উপজেলায় সিনেপ্লেক্স

২৩শে মার্চ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সিনেমা শুধু বিনোদন নয়, সমাজ সংস্কারের মাধ্যম। বিনোদনের সাথে সাথে আমাদের সমাজ সংস্কারে, মানুষকে শিক্ষা দেওয়া বা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িতদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এফডিসি গড়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের চলচ্চিত্রশিল্প এগিয়ে যাক। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি। যে তরুণরা সিনেমাশিল্পে এগিয়ে এসেছেন আমি বিশেষভাবে তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এরাই তো ভবিষ্যৎ।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'অনেক শিল্পী বৃদ্ধকালে করুণ অবস্থায়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিজয়ীদের মাঝে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০' প্রদান করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

পড়েন। আমরা শিল্পী, কলাকুশলীদের জন্য ফান্ড ট্রাস্ট করে দিয়েছি। যাতে আমাদের কোনো শিল্পী কষ্ট না পান।' নিজেকে সিনেমাপ্রেমী বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি জানান, 'প্লেনে করে দেশের বাইরে গেলে দেশি সিনেমা দেখি। প্রোডাকশনগুলো খুব ভালো লাগে। কেউ যদি পেনড্রাইভে ছবি পাঠান সেটাও দেখি। ভালোই লাগে সিনেমা দেখতে। আমাদের দেশে সুপ্ত প্রতিভা আছে। তাদের কাজ দেখে মুগ্ধ হই।'

বরিশালে আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

'ফ্রেমে ফ্রেমে আগামীর স্বপ্ন'–স্লোগান নিয়ে ১৫তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০২২-এর দুই দিনব্যাপী বরিশাল বিভাগীয় উৎসব শুরু হয়েছে। চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের উদ্যোগে বরিশাল জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ১৩ই মার্চ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দিন হায়দার। এসময় ইউনিসেফ বরিশাল বিভাগীয় প্রধান তৌফিক আহম্মদ, চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটি বরিশাল আহ্বায়ক তনিমা রহমান খান ও শহিদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পাপিয়া জেসমিনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ১৩ই মার্চ থেকে শুরু হওয়া উৎসব শেষ হয়েছে। দুই দিনব্যাপী উৎসবে সকাল ১১টা, দুপুর ২টা, বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬টায় মোট ৪টি প্রদর্শনীতে ৯টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে। চলচ্চিত্র সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

প্রতিবেদন: মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

কক্সবাজারে ডোপ টেস্ট

কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে ডোপ টেস্ট কর্যক্রম চালু হয়েছে। ১৬ই মার্চ এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সংসদ সদস্য সাইমুম সরওয়ার কমল। জেলা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এমপি কমল বলেন, 'প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এখন সবকিছু আধুনিক হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশ উন্নতি করছে। ফলে ডোপ টেস্ট এখন একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী আগেই ঘোষণা দিয়েছেন ডোপ টেস্ট ছাড়া সরকারি চাকরিতে যোগাযোগ করা যাবে না। ড্রাইভিং লাইসেন্সও পাওয়া যাবে না। কারণ কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তি দেশের জন্য সঠিক কাজটি করতে পারবেন না। মাদকাসক্তরা গাড়ি চালালে দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ ঝরে যেতে পারে। তাই চালকের লাইসেন্স পেতে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।'

মাদক প্রবেশ ঠেকাতে সাগরে টহলে নামছে নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

একসময় দেশে মাদকের বাজারে গাঁজা, ফেনসিডিল, হেরোইন, ইয়াবার আধিপত্য থাকলেও সম্প্রতি বিস্তার ঘটছে আলোচিত ক্ষতিকর মাদক আইস (মেথামফেটামিন) বা ক্রিস্টাল মেথের। আইস দেশে আবির্ভূত হয় ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। তখন রাজধানীর জিগাতলার একটি বাসায় ধরা পড়ে মাত্র পাঁচ গ্রাম। এরপর ওই বছরের জুন মাসে রাজধানীর খিলক্ষেতে ধরা পড়ে ৫২২ গ্রাম আইস। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নানা তৎপরতায় ওই বছর এবং তার পরের বছর ২০২০ সালে আইস আসা কমে যায়। ২০১৯ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মোট ৫৬১ গ্রাম আইস জব্দ করে। পরের বছর ২০২০ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও কোস্ট গার্ডসহ সব সংস্থা জব্দ করে দশমিক ০৬৫ গ্রাম আইস।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বাহা উৎসব

সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজস্ব ঐতিহ্যে নাচ-গানে বরণ করলেন ঋতুরাজ বসন্তকে। করোনার বাঁধা পেরিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতি বাহা পরবে মাতলো গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতাল পল্লি। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কামদিয়া ইউনিয়নের তল্লাপাড়া গ্রামে সেভেন্থ ডে এ্যাডভেন্টিস্ট প্রি সেমিনারি স্কুল প্রাঙ্গণে ২৩শে মার্চ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ও অবলম্বনের আয়োজনে বাহা পরব বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন করল সাঁওতালরা।

দিনভর ধর্মীয় পূজা-অর্চনা ও সাঁওতাল সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিবেশনায় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক সাঁওতাল নারী-পুরুষ-কিশোরী অংশ নেন। বিভিন্ন সাঁওতাল-বাঙালিদের আগমনে মিলনমেলায় পরিণত হয় গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতাল অঞ্চল। পরে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত সাঁওতাল সাংস্কৃতিক দলের সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এতে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ৬টি ইউনিয়নের ৭টি সংস্কৃতিক দল অংশগ্রহণ করে।

সাঁওতালরা আমাদের এ দেশেরই নাগরিক, তাদের কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এ দেশের সংস্কৃতিরই অংশ। বসন্ত ঋতু আসলেই গাছে গাছে নতুন ফুলের সমারোহ প্রকৃতি প্রিয় মানুষের দৃষ্টি কাড়ে। শিমুল, পলাশে শোভায় প্রকৃতি নিজেকে নতুন রূপে প্রকাশ করে। সাঁওতালরাও বসন্তকে বরণ করে নেয় তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য দিয়ে। এসময় সাঁওতাল তরুণীরা নতুন নতুন ফুল তাদের খোঁপায় গেঁথে, আনন্দে নাচে-গানে মেতে ওঠে। সাঁওতাল গ্রামে গ্রামে

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাসিন্দাদের প্রধানতম সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব 'বৈসাবি'। নদীতে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে ফুল পূজো করে চাকমারা 'ফুল বিজু' উদ্‌যাপন করছেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০২২ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত 'টুঙ্গিপাড়া: হৃদয়ে পিতৃভূমি' অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন– পিআইডি

চলে আনন্দ উৎসব। বাড়ি বাড়ি তৈরি হয় হাঁড়িয়া। সবাই হাঁড়িয়া খেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে মাদলের তালে তালে গাইতে থাকে, নাচতে থাকে। আর সেই আনন্দ-উৎসবের নাম 'বাহা পরব'।

সাঁওতালদের অন্যতম একটি প্রধান পার্বণ হচ্ছে 'বাহা উৎসব। বাহা অর্থ ফুল। তাই বাংলায় বাহা পরবকে 'ফুল উৎসব' বলা হয়। মূলত, নববর্ষ হিসেবে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালন করে সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী-সাঁওতালরা। উত্তরাঞ্চলে সমতলে বসবাসকারী জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে উড়াও, মুণ্ডা, মালো, মহাতো, মালপাহাড়ি, রাজওয়ারসীসহ মোট ৩৮টি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী এই বাহা উৎসব পালন করে থাকে।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় শিশু দিবস পালিত

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়। জাতীয় শিশু দিবস এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এদিন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এদিন টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি প্রাঙ্গণে শিশুদের জন্য রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানে শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং শিশুদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অনুষ্ঠানটি দেশের সকল জেলায় একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিশু দিবস ২০২২-এর মূল প্রতিপাদ্য– বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার।

৬৫৯টি থানায় শিশু ডেস্ক উদ্‌বোধন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ই এপ্রিল দেশের ৬৫৯টি থানায় নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের সেবায় স্থাপিত সার্ভিস ডেস্কের উদ্‌বোধন এবং গৃহহীনদের জন্য পুলিশের নির্মিত ৪০০টি ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানটি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইন্স, রাজারবাগে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর সঙ্গে সকল থানা, পুলিশ রেঞ্জ ও পুলিশ লাইনস সংযুক্ত ছিল।

ধর্ষণ, নির্যাতন অথবা অন্য যে-কোনো অপরাধের শিকার নারী ও শিশুরা যাতে নিঃসংকোচে থানায় গিয়ে তাদের অভিযোগ জানাতে পারে সে জন্য দেশের প্রতিটি থানায় বসানো হয়েছে এই সার্ভিস ডেস্ক। যেখানে ডেস্ক পরিচালনার জন্য একজন সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে প্রশিক্ষিত নারী পুলিশ সদস্যদের পদায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব সার্ভিস ডেস্কের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জেলা রেঞ্জ ও পুলিশ সদর দফতর কঠোরভাবে মনিটরিং করবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে এ সার্ভিস পরীক্ষামূলক চালু করা হয়।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

মেলা প্রাঙ্গণেই ৫২ জন প্রতিবন্ধীর চাকরি

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) আয়োজিত মেলায় এসে সরাসরি চাকরি পেল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ পাওয়া ৫২ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। বিভিন্ন চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত তালিকায় রয়েছেন আরও ৩১০ জন। ২০শে মার্চ ২০২২ রাজধানীর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ২০শে মার্চ ২০২২ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকরি মেলা ২০২২'-এর উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

আগারগাঁওয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে প্রতিবন্ধীদের জন্য এ চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচ শতাধিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সরাসরি অংশ নেন। দিনব্যাপী এ মেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসহ ৫২টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। মেলা প্রাঙ্গণেই প্রার্থীদের কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই করার পাশাপাশি সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয় প্রতিষ্ঠানগুলো।

সেন্টার ফর সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (সিএসআইডি) ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সহযোগিতায় আয়োজিত এ মেলার উদ্‌বোধন করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, ১০ বছর আগেও মনে করা হতো, প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা। তবে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ ও প্রযুক্তির কল্যাণে সে ধারণা এখন অনেক বদলেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অক্ষমতা না দেখে, তাদের সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য ব্যক্তি ও সমাজের মনোভাবের পরিবর্তন জরুরি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চাকরির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে কাজ করছে সরকার।

পরীক্ষায় প্রতিবন্ধীদের জন্য বাড়তি সময়ের অভিন্ন নীতিমালা

নিয়োগ ও একাডেমিক পরীক্ষায় শ্রুতিলেখক নিয়োগে অভিন্ন নীতিমালা তৈরি করছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ের চেয়ে এক-চতুর্থাংশ অতিরিক্ত সময় পাবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রুতিলেখকদের যোগ্যতাও নির্ধারণ করা হচ্ছে এই নীতিমালায়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করে ২০শে মার্চ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়।

নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলা হয়– নিয়োগ পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় শ্রুতিলেখকের বিধান চালু থাকলেও প্রতিটি কর্তৃপক্ষ নিজস্ব পদ্ধতিতে এটা করে থাকে। প্রতিষ্ঠান ভেদে শ্রুতিলেখক নিয়োগের বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রতিবন্ধীদের নানা বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। যার কারণে এই অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, নীতিমালাটা করা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন মন্ত্রণালয় এটা বাস্তবায়ন করেনি। আমরা বলেছি সামনে যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ হবে, সেখানে যেন এটা বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে টাইগারদের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে প্রথমবারের মতো ঐতিহাসিক সিরিজ জয় করেছে টাইগাররা। ২৩শে মার্চ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ৯ উইকেটের বিশাল জয় পায় তামিম ইকবালের দল। এর আগে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে টাইগারদের বোলিং তোপের মুখে মাত্র ১৫৪ রানে অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ দল ৯ উইকেট হাতে রেখে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। এদিন লিটন-তামিম জুটি প্রোটিয়াদের বিপক্ষে নিজেদের করা ৯৫ রানের পার্টনারশিপের রেকর্ড ভেঙে গড়লেন ১২৭ রানের পার্টনারশিপের রেকর্ড। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন টাইগার পেসার তাসকিন আহমেদ। একইসঙ্গে তিনি সিরিজ সেরাও হন তিনি।

কেনিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি টুর্নামেন্টের ফাইনালে কেনিয়াকে ৩৪-৩১ পয়েন্টে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এর ফলে দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল বাংলাদেশ। ২৪শে মার্চ শহিদ নূর হোসেন জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়ামে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ২৩শে মার্চ শহিদ নূর হোসেন ভলিবল আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ইরাককে ৫৫-৩৬ পয়েন্ট ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ। অন্যদিকে, শ্রীলঙ্কাকে ৪৯-২৯ পয়েন্টে হারিয়ে কেনিয়া ফাইনালে ওঠে। ২০২১ সালেও প্রতিযোগিতার প্রথম আসরে কেনিয়াকে ৩৪-২৮ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ।

বিশ্বকাপের সেরা একাদশে বাংলাদেশের সালমা

বাংলাদেশি অলরাউন্ডার সালমা খাতুন আইসিসির নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপের সেরা একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন। ২০২২ বিশ্বকাপের সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়দের নিয়ে এই একাদশ সাজানো হয়েছে। টুর্নামেন্ট সেরা অ্যালিসা হিলিসহ দলে জায়গা পেয়েছেন বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়ার চারজন, দক্ষিণ আফ্রিকার তিনজন, ইংল্যান্ড থেকে দুইজন ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন। বাংলাদেশ থেকে একাদশে জায়গা পাওয়া একমাত্র প্রতিনিধি সালমা খাতুন। অফস্পিনিং এই অলরাউন্ডার টুর্নামেন্টে ১০ উইকেট শিকার করেছেন।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

না ফেরার দেশে কথাসাহিত্যিক দিলারা হাশেম

আফরোজা রুমা

বাংলা একাডেমি ফেলো, সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক দিলারা হাশেম চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ১৯শে মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

দিলারা হাশেম ১৯৩৬ সালের ২১শে আগস্ট যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে দিলারা হাশেম যোগ দেন তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানে। সেখানেই একজন ব্রডকাস্টার হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। তিনি তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান করাচি থেকে দীর্ঘদিন নিয়মিত বাংলা সংবাদ পাঠ করতেন। পরে তিনি ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনেও সংবাদ পাঠ করেন। আরও পরে তিনি পাড়ি জমান আমেরিকায়, যোগ দেন ভয়েস অব আমেরিকায়। সেসময় বিবিসি আর ভয়েস অব আমেরিকা জনপ্রিয় মিডিয়া ছিল। ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগে কাজ করে ২০১১ সালে অবসর নেন। এরপর বসবাস করছিলেন সে দেশেই। তিনি ১৯৮২ সালে ভয়েস অব আমেরিকায় পূর্ণকালীন ব্রডকাস্টার হিসেবে যোগদান করেন। তার আগে বেশ কয়েক বছর তিনি ভয়েস অব আমেরিকায় খণ্ডকালীন রেডিও ব্রডকাস্টার হিসেবে কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে তিনি বিবিসি লন্ডনেও মাঝে মাঝে বাংলা সংবাদ পাঠ করতেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে দিলারা হাশেম এক অনন্য নাম। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে সাহিত্যচর্চা শুরু করে আমাদের কথাসাহিত্য ভুবনে তিনি যোগ করেছেন বিশেষ মাত্রা। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বহুল আলোচিত উপন্যাস *ঘর মন জানালা*। যা বাঙালি পাঠক সমাজে দারুণভাবে সাড়া ফেলেছিল। মধ্যবিত্ত সমাজে নাগরিক জীবনের সংগ্রামী এক নারীর সমস্ত বাধা আর ঘুরে দাঁড়ানোর জীবন আখ্যানকে কেন্দ্র করে রচিত এই উপন্যাস তুমুল সাড়া ফেলেছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৩ সালে যা রূপান্তরিত হয়েছিল চলচ্চিত্রে। অনূদিত হয়েছিল রুশ ও চীনা ভাষায়।

১৯৭৬ সাল থেকে ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগে কর্মকালে তিনি বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালি সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকায়নেও প্রাগ্রসর ভূমিকা রেখেছেন। দিলারা হাশেমের রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে– *একদা এবং অনন্ত* (১৯৭৫), *স্তব্ধতার কানে কানে* (১৯৭৭), *আমলকির মৌ* (১৯৭৮), *বাদামী বিকেলের গল্প* (১৯৮৩), *কাকতালীয়* (১৯৮৫), *মুরাল* (১৯৮৬), *শঙ্খ করাত* (১৯৯৫), *অনুক্ত পদাবলী* (১৯৯৮), *সদর অন্দর* (১৯৯৮), *সেতু* (২০০০), *মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমূহ* (২০১১)। উপন্যাস ছাড়াও তিনি অনেকগুলো গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে– হলদে পাখির কান্না (১৯৭০), সিন্ধু পারের উপাখ্যান (১৯৮৮), নায়ক (১৯৮৯)। কবিতা লিখেছেন– ফেরারী (১৯৭৭)।

দিলারা হাশেম সাহিত্যকর্মে বিভিন্ন সময় নানা পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে– বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৬), শঙ্খচিল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৪), উত্তর শিকাগো 'কালচারাল অ্যান্ড লিটারারি ইঙ্ক' সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৭), অলক্ত পুরস্কার (২০০৪) ও মুক্তধারা জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার (২০১৯)।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক দিলারা হাশেমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। শোকবার্তায় তিনি সাহিত্যিক দিলারা হাশেমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত দিলারা হাশেমের সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতায় তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। শোকবার্তায় তিনি বলেন, সাহিত্যিক হিসেবে দিলারা হাশেম তাঁর বিরল ও ব্যতিক্রমী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 11, April 2022, Tk. 25.00

গ্রামীণ বৈশাখি মেলা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd